অষ্টক

অষ্টক

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিহার সাহিত্য ভবন
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ—১৩৫৪

প্রকাশক—
শ্রীশক্তিকুমার ভাদুড়ী
৫, ডফ্ লেন, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—
শ্রীকার্তিকচন্দ্র দে
নিউ মদন প্রেস
৯৫, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদপট—
শ্রীসূর্য রায়

ব্লক-নির্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
দি গয়া আর্ট প্রেস
৫০সি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা।

বাঁধিয়েছেন—
বাসন্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
৫০, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা।

দাম—
দু' টাকা বারো আনা

"অষ্টক" বইখানি সাহিত্য-রসিক বন্ধু—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেনশর্ম্মার হস্তে—

সমর্পণ করিলাম।

ব. ভ. ম.



ভাড়া

১

কাজটা বোধ হয় অন্যায় হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কাঠ-রসিকতার জ্বালায় মনের অবস্থা তখন এমন দাঁড়াইয়াছিল যে, ও কথাটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর হয় নাই। এখনও যে খুব অনুতপ্ত আমি একথাও ধর্ম সাক্ষী করিয়া বলিতে পারি না।

বরযাত্রীর দল কলিকাতা হইতে লুপ লাইনে সাহেবগঞ্জ যাইতেছে। একে বরযাত্রী, তায় কলিকাতার, তাহার উপর আবার যাইতেছে বেহারে—সকলেরই যথাসম্ভব স্মার্ট আর রসিক হইবার চেষ্টা! কিন্তু সুবিধা হইতেছে না। শেষে লুপ এক্সপ্রেসটা যখন কোন্নগর পার হইল তখন একজন বলিল—"না, এ জমছে না, সেরামপুরে গাড়ি থামলে বরদা খুড়োকে টেনে নিয়ে আসতে হবে বরের গাড়ি থেকে—বাঃ, ওঁরা বরও নেবেন আবার বরদাও নেবেন!"

গাড়িটা প্রায় ওরাই বোঝাই করিয়া রাখিয়াছে, সমর্থনের একটা তুমুল কলরব উঠিল—"খুড়োকে চাই!…খুড়োকে চাই!…আমাদের খুড়োকে চাই!…বাঃ, বর বরদা দুই নেবে, মাংনা নাকি?…"

অমথাই কলরবের সঙ্গে একটা হাসি উঠিল, একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া "খুড়ো হে!—এসো হে—আধ আঁচরে বোস হে!"...বলিয়া যাত্রার জুড়ির মতো হাত খেলাইয়া তান ধরিয়া দিল, একজন উঠিয়া তাহার টুঁটিটা ধরিয়া নাড়া দিয়া গানের গিটকিরি তৈয়ার করিয়া চলিল; হাসির আর একটা তোড় উঠিল।

এদের সঙ্গে আমায় বর্ধমান পর্যন্ত যাইতে হইবে, অস্থির হইয়া পড়িয়াছি যাই হোক, একটু আশান্বিত হইলাম, যাহার নাম উচ্চারণেই এতটা উল্লাস তাহাকে দেখিবার জন্য কৌতূহল লইয়া বসিয়া রহিলাম।

গাড়িটা সেরামপুরে থামিতে প্রায় অর্ধেক লোক হৈ-হৈ করিতে করিতেনামিয়া গেল, বরের গাড়িতে হাসি-হল্লার মধ্যেই একটা টানাটানি পড়িয়া গেল—ওরাও ছাড়িবে না, এরাও নিরস্ত হইবে না—তাহার পর "থ্রি চিয়ার্স ফর্ খুড়ো!...লং লিভ খুড়ো!...খুড়ো জিন্দাবাদ!"—বলিতে বলিতে সমস্ত প্লাটফর্ম কাঁপাইয়া একটি লোককে মাঝে করিয়া সবাই এ-কামরায় আসিয়া উঠিল, গাড়িটা ছাড়িয়া দিল।

লোকটা বেঁটেসেঁটে গোলগাল, মাথায় টাক, তাহার নিচে বাবরি; মোটা এক জোড়া গোঁফ বাটারফ্লাই করিয়া ছাঁটা; সর্বসাকুল্যে চেহারাটায় একটু হাসির উদ্রেক করে, তাহার উপর মুখটা আর চোখ দুইটা এমনভাবে একটু কুঞ্চিত যে, মনে হয় যেন এখনই ভয়ানক একটা হাসির কথা বলিবে বা হাসির কিছু একটা করিবে। বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হইবে।

গাড়ির মধ্যে আসিয়াই লোকটা হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইল চোখ-মুখ আরও কুঞ্চিত করিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া লইল; অত যে গোলমাল এক মুহূর্তেই ঠাণ্ডা হইয়া গিয়া সবাই মস্ত বড় কিছু একটা

প্রত্যাশা করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, দু'একটা চাপা হাসির খুক্-খুক্ শব্দ হইল, একটু থাকিয়া একজন বলিল,—"কি খুড়ো?—তুমি যে একেবারে স্ট্যাচু মেরে আলোর দিকে চেয়ে রইলে!"

খুড়ো বিমূঢ়ভাবে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"একি! আমার গান পাচ্ছে কেন এতো!"

চাপা হাসির সংখ্যা আরও বাড়িয়া গেল, একজন বলিল,—"তা গান পাচ্ছে তো গাওনা বাবা, সেই জন্যেই তো তোমায় পাকড়াও করে আনা..."

খুড়ো বাঁ হাতে কানটা ঢাকিয়া ডান হাতটা লম্বা করিয়া বাড়াইয়া দিয়া একেবারে সপ্তমে তান ধরিল—"শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী, কেন বা তোমার এ-হেন বে-এ-এ-শ!"

প্রচণ্ড হাসির চোটে মনে হইল যেন ছাতটা ভাঙ্গিয়া পড়িবে, সেই সঙ্গে নানারকম বুলি—"থ্রি, চিয়ার্স ফর খুড়ো!...এন্‌কোর খুড়ো এন্‌কোর!...এন্‌কোর।"

তোড়টা একটু থামিলে দু' একজন হাসিতে হাসিতেই বলিল—"আর গান খুঁজে পেলে না বাবা?...বাসর ঘরে এই গানই গেয়েছিলে নাকি খুড়ো? এ যে বরযাত্রী গো..."

খুড়ো হাত দু'টো চিতাইয়া নিরীহভাবে বলিল—"বরযাত্রী কি শ্মশানযাত্রী কি করে বুঝব বাপধনেরা? একেবারে যে নিঝুমের পালা চলেছিল..."

সবার হাসির মধ্যেই এদিকে চাহিয়া হঠাৎ আমায় সাক্ষী মানিল—"কি মশাই, একেবারে শ্মশান করে রাখেনি?"

আমার পিত্ত জ্বলিয়া যাইতেছিল, ভাবিয়াছিলাম যে রকম জুলুস

করিয়া আনা, বোধ হয় একজন প্রকৃত হাস্যরসিকের সঙ্গ পাওয়া যাইবে, এ একেবারে চড়কতলার সং! উত্তর দিবার প্রবৃত্তি না থাকায় চুপ করিয়া ছিলাম, খুড়ো ভয় এবং দুঃখের অভিনয় করিয়া বলিল—"কি মশাই, একটু সমর্থন করুন, একা পড়ে যাচ্ছি যে,—করে রাখেনি শ্মশান?

একটু খুক-খুক করিয়া শব্দ হইল, বোধ হয় একটি অপরিচিত ভদ্রলোককে এ ভাবে কোণঠাসা হইতে দেখিয়া। আমি বলিলাম—"আজ্ঞে, এতক্ষণ ততটা বুঝতে পারিনি, এখন শেয়ালডাকার শব্দে আর সন্দেহ নেই বটে।"

খুক-খুক শব্দটা আরও কয়েক কণ্ঠে চারাইয়া পড়িল, খুড়ো একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল; কিন্তু একেবারে দু'কান কাটা, তখনই সামলাইয়া লইল;—আমার দিক থেকে ফিরিয়া বলিল—"শুনলে তো? একবার একটা বিড়ি কি সিগারেট ছাড়ো দিকিন, শেয়ালের গলা ভেঙে গেছে, একবার শাণিয়ে নিতে হবে—"

—বলিয়া মুখটা উঁচু করিয়া হাত দুটো বাড়াইয়া ধরিল এবং গলাটা চাপিয়া ভাঙা গলার মতো করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"হুয়া কাক্কা—বিড়ি! হুয়া কাক্কা—সিগারেট!"

আবার একটা প্রচণ্ড হাসির তোড় উঠিল এবং আমার পরাভবে কয়েকটা তির্যক দৃষ্টি আমার উপর আসিয়া পড়িল। এই সময় কোন কারণে সিগনেল না পাওয়ায় গাড়িটা আসিয়া শেওড়াফুলিতে দাঁড়াইয়া পড়িল।

২

একজন চাষাভূষা গোছের লোক হঠাৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া আমাদের গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা ধরিল এবং ঘাড়টা প্লাটফর্মের দিকে ঘুরাইয়া হাঁকিল—"ইদিকে—ও ঘোষের পো! ও বদন! ও বেচারাম!… ইদিকে!"

গাড়ির পিছন দিক থেকে একসঙ্গে কয়েকটি কণ্ঠে উত্তর হইল—"এরা কইচে এ-গাড়ি লয়, উঠ্‌নি তুমি…"

লোকটা পা-দানে একটা পা তুলিয়া দিযাছিল, টানিয়া লইয়া একটু ভ্যাবাচ্যকা খাইয়া প্রশ্ন করিল,—"কারা—কারা কইচে গো?"

সিগনেল পাইযা গাড়িটা হুইসেল দিল।

খুড়ো টপ করিযা উঠিয়া পড়িল. দরজার দিকে ত্রস্তভাবে অগ্রসর হইতে হইতে বলিল—"না হে মোড়লের পো, এই গাড়ি, উঠে পড়ো, উঠে পড়ো, গাড়ি ছেড়ে দিলে বলে…"

ঝাঁ করিয়া দরজাটা খুলিয়া লোকটাকে একরকম টানিয়া তুলিয়াই দরজা দিযা গলাটা বাড়াইয়া হাঁকিল—"এই গাড়িই গো ঘোষের পো বোসের পো, বদনচন্দ্র, বেচারাম—উঠে পড়ো তোমরাও…"

গাড়িটা ছাড়িয়া দিল এবং যে হাসি বোধ হয় এইটুকুর জন্যই আটকানো ছিলো সেটা একেবারে প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। লোকটি কিম্ভূতকিমার হইয়া গেছে, গদি আঁটা গাড়ি, তাহার উপর যাত্রী সব একেবারে সেরা কাপড়-চোপড় পরা ভদ্রলোক—গায়ে গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে—ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। খুড়ো একজনকে হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল, বলিল—"বাঃ, কী আমার মামার

ঝাড়ির অবদার রে, মোড়লের পো দাঁড়িয়ে—আর উনি নবাব খাঞ্জাখাঁর মতো গদিয়ান হয়ে বসে থাকবেন!...

শহরে শহরে হাসি চলিতেছে। নিজের কোমরে বাঁধা সিল্কের চাদরটা তাড়াতাড়ি থিয়েটারি ঢঙে খুলিয়া জায়গাটা ঝাড়িয়া বলিল—"এই বোস কর্তা, কোথায় যাওয়া হবেন কর্তার?"

ঝুঁকিয়া দুই হাঁটুতে ভর দিয়া গভীর বিনয়ের অভিনয় করিতে হাসিটা আর একটা তোড়ে ভাঙিয়া পড়িল।

গাড়ি বেশ জোর দিয়াছে। আমি বিস্ময়ে একেবারে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া গেছি। ভাঁড়ামি অনেক দেখিয়াছি, গা-জুরি ফুর্তি জমাইবার চেষ্টায় বরযাত্রীদের মধ্যে সেটা যে আরও কিরূপ বিকৃত রূপ ধারণ করে তাহারও অভিজ্ঞতাও কম নয় আমার, কিন্তু এ ধরণের ব্যাপার কখনও চাক্ষুষ করি নাই। একেবারে থ হইয়া গেছি। উচিত ছিল তখনই চেন টানিয়া দিয়া স্টেশনের লোক ডাকিয়া সদ্য সদ্য এর একটি বিহিত করা, কিন্তু যখন চৈতন্য হইল তখন গাড়ি অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছে।

কোথায় যাইবে শুনিবার জন্য আমিও কৌতূহলী হইয়া সামনে ঝুঁকিয়া বসিলাম, খুড়োর প্রশ্নের উত্তরে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া বলিল—"আমি যাবো বাবু সাঁইতেড়ে, মানকুণ্ডুর টিকিস আমার, সেখানে নেমে রেল পেইরে তারপর হাঁটাপথে চালদাডাঙ্গা হয়ে বড় রাস্তায়..."

খুড়ো গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতে শুনিতে মুখটা একটু কুঞ্চিত করিয়া খুব একটা হাসির কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল, বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"ও ব্বাবা মানকুণ্ডুতে নেমে, রেল পেইরে, চালদাডাঙ্গা হয়ে তারপর বড় রাস্তা। তার চেয়ে এক কাজ করো কত্তা—সায়েবগঞ্জে নেমে মোটরে করে একেবারে বিয়েবাড়ীতে খ্যাটের আসনে—লুচি,

পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা, রাবড়ি মালাই !…”

ডান হাতটা ভুরিভোজনের ইঙ্গিতে মুখ এবং একটা কাল্পনিক পাত্রের মাঝে ওঠানামা করানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দলটার মধ্যে আবার হাসির একটা হররা উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে নানারকম মন্তব্য “হ্যাঁ, সাহেবগঞ্জেই চলো কত্তা…নিয়ে চলো খুড়ো…কত্তাকে ছাড়া হবে না…চলো হে কত্তা…রাবড়ি-মালাইয়ের দেশ ঘুরে আসবে !…”

আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না, সামনে হেলিয়া বলিলাম—“মশাই, মাফ করবেন, এটা আপনাদের কি ধরণের রসিকতা হচ্ছে জিগ্যেস করতে পারি কি ?”

হাসি-হল্লা সব একেবারে চুপ হইয়া গেল, খুড়োও একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পর তাহার মুখটা খুব অল্প হাসির আভাসে একটু কুঞ্চিত হইযা উঠিল, হাত জোড় করিয়া আমার দিকে ঝুঁকিয়া আমারই মতো করিয়া বলিল,—“মশাই, মাফ করবেন,—রসিকতার ধরণটা বললে আপনি বুঝতে পারবেন কি ?”

খুক্-খুক্ করিয়া চারিদিকে আবার চাপা হাসির শব্দ উঠিল। আমি উত্তর করিলাম,—বলুনই না, চেষ্টা করে দেখি।”

“শৃগা-আ-আ-আ-ল রসিকতা !”

উচ্চ উৎকট হাস্যে সবাই একেবারে ভাঙিয়া পড়িল ; খুড়ো আমার দিক থেকে মুখটা ফিরাইয়া দলের দিকে ঘুরিয়া হুয়া-কাকা, হুয়া-কা-কা করিয়া হাসির সঙ্গে শিয়ালের ডাক মিশাইয়া এমন একটা অদ্ভুত আর বিকট রব করিতে লাগিল যে হাসিটা আর থামার অবসর পাইল না অনেকক্ষণ ধরিয়া।

অবশেষে খানিকটা প্রশমিত হইলে আমি বলিলাম—“কিন্তু রসিকতার

পাশাপাশটা কি ভেবে দেখেছেন ?"

খুড়ো আমার দিকে ঘাড় বাঁকাইয়া গম্ভীরভাবে বলিল—"সাহেবগঞ্জে আসনে বসে লুচি, পোলাও, কোর্মা, কোপ্তা…"

আবার হাসির তোড় নামিল, আমার রাগটা তখন বেশ বাড়িয়া গেল, হাসির উপরে গলাটা তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, অতদূর পর্যন্ত এগুবার দরকার হবে না ; চন্দননগরেই তার ব্যবস্থা করছি, একেবারে রাজ্য-অতিথি হয়ে লুচি পোলাও ওড়ালেন।—আপনারা একটা নিরীহ পাড়াগেঁয়ে লোককে জবরদস্তি ভুল গাড়িতে তুলে…"

সবার হাসির মধ্যে খুড়ো গলাটা ওদের মধ্যে বাড়াইয়া ভয়ের অভিনয়ের সহিত চাপা গলায় বলিল,—"উকিল।"

আবার হাসিটা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আমি আপাতত আর বাক্যব্যয় নিরর্থক দেখিয়া নিজের জায়গাটিতে ঠেস দিয়া বসিলাম। এটা পরোক্ষভাবে আমার হারস্বীকার বলিয়া ধরিযা লইয়া উহারা আরও ভালো করিয়া লোকটাকে লইয়া পড়িল। খুড়ো দুইটা সীটের পর বসিয়াছিল লোকটার পাশে আসিয়া বসিতে বসিতে বলিল—"সরো দিকিন তোমরা, কত্তার সঙ্গে একটু আলাপ জমাই…তা তোমায় অত ভাবতে হবে না কত্তা প্যাসেঞ্জারে সব মাটি মাড়াতে মাড়াতে আসতে, এ একেবারে শ্যাওড়াফুলি থেকে চন্দননগর, সঙ্গে-সঙ্গে কত্তার জন্যে ব্যাণ্ডেলের দিক থেকে ডাউন প্যাসেঞ্জার, তাইতে চড়ে টুপ করে এসে মানকুণ্ডুতে নেমে পড়া ; সেই ভালো, না, সেই ধিকুতে-ধিকুতে-ধিকুতে…"

লোকটা একেবারে অকূলে পড়িয়াছিল, একটা উপায় হওয়ায় খুড়োর শেষের দিকে ঘোঁড়ার চলনের নকল করিয়া বলিবার ভঙ্গিতে একটু হাসিয়াই ফেলিল, বলিল—"বাবুরা যখন রয়েছেন…"

"কত্তা হেসেছে! কত্তা হেসেছে!" বলিয়া খুড়ো খানিকটা লাফাইয়া উঠিল; হাসির সঙ্গে খুয়াটা সমস্ত গাড়িতে ছড়াইয়া পড়িল—"কত্তা হেসেছে! কত্তা হেসেছে!"

আমি মুখটা বাহিরের দিকে ফিরাইয়া লইলাম; শৃগাল-রসিকতার মধ্যে গাড়িটা মাঝের স্টেশনগুলা ছাড়াইয়া চন্দননগরে আসিয়া দাঁড়াইল।

৩

চন্দননগরে একজন ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রী আর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে লইয়া দরজার সামনে আসিতে সকলে হৈ-চৈ করিয়া তাঁহাকে ভাগাইয়া দিল, অবশ্য খুড়োই অগ্রণী। ভদ্রলোক খানিকটা দূরে চলিয়া গেলে অস্ফুট স্বরে বোধ হয় কিছু একটা অভদ্র রসিকতা করিতে কাছা-কাছির সবাই চাপা গলায় হাসিয়া উঠিল; যাহারা শুনিতে পাইল না কৌতূহলী হইয়া উঠিল, একটু কানাঘুষা হইল, তাহার পর সেই চাপা হাসিটা গাড়িময় চারাইয়া পড়িল। গা ঘিন-ঘিন করিতেছে, ইচ্ছা হইল নামিয়া যাই, কিন্তু সব গাড়িতেই অসহ্য ভিড়, জায়গা পাওয়া প্রায় অসম্ভব, গাড়ি থামিবেও অল্প, নিরুপায়ভাবে বসিয়া রহিলাম।

ইতিমধ্যে সেই লোকটা নামিয়া গেছে, বোধ হয় পুল পার হইয়া গিয়া থাকিবে। খুড়ো গলাটা বাড়াইয়া ডাকিল—"ও কত্তা! ও মোড়লের পো!"

তাহার পর হঠাৎ গলাটা নামাইয়া বলিল—"আরে উকিল করেছিলি, ফি নিয়ে আয় বেটা—লাউ ডাঁটা, কুমড়ো ডাঁটা যা হয়..."

আর একজন বলিল—"বেটা খুব ফাঁকি দিলে খুড়ো।"

আমি প্ল্যাটফর্মের উল্টা দিকে বসিয়া আছি, তবুও সব শুনিতে

পাইতেছি, কেননা সেইভাবেই বলা। খুড়ো ঘাড়টা একটু বাঁকাইয়া—আড়-চোখে তাহার পানে চাহিয়া খুব গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—"না, একেবারে ফাঁকি দেয়নি ; তা কি পারে ? বাপরে, উকিল মানুষ!"

"কি দিয়েছে ?—কি দিয়েছে খুড়ো ?"—বলিয়া সকলে তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে আরও গম্ভীর হইয়া দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দুইটা নাড়িতে নাড়িতে বলিল—"কেন, অষ্টরম্ভা!"

সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তির্যকভাবে আবার অনেকগুলি চক্ষু আমার উপর আসিয়া পড়িল।

এমন সময় খুড়ো হৈ-হৈ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল—"এসেছে। এসেছে! ঐ দেখ; তোদের খুড়োর কথা মিথ্যে ভেবেছিস ? বাবা, এই মুখে শাপ দিলে আগে সঙ্গে সঙ্গে ভস্ম হয়ে যেত—বেশিদিনের কথা নয়, এই মাত্র কয়েক লাখ বছর আগে, দ্বাপরযুগে।...এইখানে! এইখানে! নিয়ে এস হে।"

চন্দননগরের প্ল্যাটফর্মে কলার কাঁদি বিক্রয় হয়—; খুড়োর "অষ্টরম্ভা" —বলার সঙ্গে সঙ্গে সত্যই কলা পৌঁছিতে দেখিয়া আবার একটা তুমুল হাসির ঢেউ উঠিল, সেই সঙ্গে একটা চিৎকার—"এসেছে অষ্টরম্ভা! অষ্টরম্ভা!"

ঠিক এই সময় একটা মোটাসোটা গোছের লোক বোধহয় ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগেই গাড়িটাতে উঠিয়া পড়িল। ওদিকে স্টার্টার দিয়াছে, ইঞ্জিন বাঁশি বাজাইল।

কাঁদি লইয়া লোকটা সামনে আসিল।

"কত দাম ?"

"এজ্ঞে, তিন টাকা।"

"অত হবে না, দু'টাকায় রফা করো।"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

"এজ্ঞে, আর চারগণ্ডা পয়সা দেন।"

"আচ্ছা দাও, দাও।"

খুড়ো কাঁদিটা লইয়া লইল। তারার পর এক হাতে পকেট থেকে একটা ব্যাগ বাহির করিয়া বেশ ভালো করিয়া চাপিয়া ধরিয়া হাঁকিতে লাগিল—"ওরে আমার ব্যাগ থেকে দামটা বের করে দেনা কেউ... দেনারে কেউ।" দু' একজন চেষ্টা করিল, কিন্তু বজ্র আঁটুনিতে উদ্দেশ্যটা বুঝিতে পারিয়া হাসিয়া ছাড়িয়া দিল, গাড়ি ততক্ষণে বেগ দিয়াছে; লোকটা কাৎরাইতে কাৎরাইতে খানিকটা অগ্রসর হইল, তাহার পর গোটা কতক বাছা বাছা গালাগালি ছাড়িতে ছাড়িতে পিছাইয়া গেল। খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

একজন ছোকরা একটু সাধুতার ভান করিয়া রাগ-রাগভাবে বলিল—"না খুড়ো, এ ভারি অন্যায় হোল, এরকম প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক্,..."

খুড়ো এক হাতে কাঁদিসুদ্ধ তাহার দিকে ত্বরিতে ঘুরিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"অন্যায়! অন্যায় কোনখান্‌টা?—বুঝিয়ে দাও আমায়।" সবাই বড় কিছু একটা শুনিবার আশায় ঝুঁকিয়া পড়িল।

ছোকরা বলিল—'অন্যায় নয়? জিনিষ নিয়ে দাম না দেওয়া...."

"দাম তো দিয়েছি! বাঃ!"

"দিয়েছ? কৈ?"

"অষ্টরম্ভার দাম অষ্টরম্ভা, তা আবার দেখতে পাবে নাকি?"

অনেকক্ষণের প্রত্যাশার পর হাসির রুদ্ধ বেগটা ছাড়া পাইয়া

গাড়িটা যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। টিকা-টিপ্পনী-বচনে নরক যেন আবার গুলজার হইয়া উঠিল।

নিরর্থকই বলা, তবুও গায়ের জ্বালায় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না, আবার গলাটা বেশ উঁচাইয়া ওদের খুড়োকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলাম—"মশাই, আপনারা মানুষ?"

সবার হাসি বন্ধ হইয়া গেল, শুধু গোটা কতক খুক-খুক শব্দ রহিল জাগিয়া। খুড়ো আবার খুব গম্ভীরভাবে আমার মুখের ওপর চোখ রাখিয়া বলিল—"আজ্ঞে না তো?"

"তা তো দেখছি, তবে কী আপনারা—তাই ঠিক করতে পারছি না।"

"আমরা?—আজ্ঞে, আমরা ছিলাম শেয়াল, এখন হয়েছি হনুমান।"

—সঙ্গে সঙ্গেই মচ করিয়া একটা কলা ভাঙিয়া না ছাড়াইয়াই মুখে পুরিয়া দিয়া এবং গাল ফুলাইয়া কাঁদিটা কাঁধে করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচ সুরু করিয়া দিল। এবার আর সবার হাসিতেও শেয়াল আর হনুমানের ডাক রহিল মেশান,—সত্যই হার মানিয়া আমি আবার নিজের সীটে এলাইয়া পড়িলাম।

৪

কাঁদিটা বেশ প্রমাণ সাইজের, তায় প্রায় আগাগোড়াই পাকা, হনুমৎ-পর্ব শেষ হইতে বেশ খানিকটা সময় লাগিল; হুল্লোড় যাহা হইল তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন কিষ্কিন্ধ্যার একেবারে মাঝখানটিতে বসিয়া আছি।

শেষ হইলে খুড়োর নবাগতের দিকে দৃষ্টি গেল,—ফাঁকতালে বোঁচি ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

চাষাভুষা মানুষ, তবে মনে হয় যেন স্বচ্ছল অবস্থার। বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সমস্ত শরীরে কোঁকড়ান কোঁকড়ান চুল, মুখে বড় বড় গোঁফ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কানেও লম্বা লম্বা চুল। গায়ে একটা ফতুয়া, তাহার আগাগোড়া খোলা, হাতে একটা দড়ি দিয়া বাঁধা ছাতা। নিশ্চয় থার্ড ক্লাসের টিকেট, উঠিয়া নিজের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া দোরের কাছটিতে গুটাইয়া সুটাইয়া বসিয়া আছে, কতকটা অপ্রস্তুত এবং যেন একটু ভীতও।

কলা খাওয়া শেষ হইলে খুড়োর নজর পড়িল, কিম্বা বোধ হয় আগেই পড়িয়াছিল এবং ইতিকর্তব্য তখনই শেষ করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন হঠাৎ দেখিতে পাইয়াছে এইভাবে একটু থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ভ্রূ দুইটা কুঁচকাইয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত খানিকক্ষণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"আরে, তুমি?"

আবার হাসি আরম্ভ হইয়া গেল, কয়েজন জিজ্ঞাসা করিল—"চেনা নাকি খুড়ো?"

খুড়ো এক পা আগাইয়া গিয়া বলিল—"চেনা নয়?—কী বলছিস তোরা!—সখা জাম্ববান যে।"

শরীরে কেশের বাহুল্যের জন্য বলা, সকলে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটিও একটু অপ্রতিভ হইয়াছে এবং বোধ হয় ভুলটা ভাঙিবার জন্যই কতকটা খোসামদের ঢঙে একটু হাসিয়া মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—"আজ্ঞে আমার নাম রিদয় মালাকার, বাড়ি বাসুলি, বংশবাটির সন্নিকটে।"

খুড়ো আস্তে আস্তে যাত্রার ঢঙে আগাইয়া গিয়া দুই হাত দিয়া লোকটির দুই বাহু ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিল—"ওঠ সখা, এ প্রবঞ্চনা কেন?—বহুদিন পরে দেখা হলেও কি ভুল করতে পারি, আমি? বলো বলো আমাদের প্রভুর কি সংবাদ, ওঠ তুমি, এরকম করে বসে কেন সখা?

তারপর ঘাড় ফিরাইয়া কয়েকজন সঙ্গীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—"সখা নল, সখা নীল, সখা গয়, সখা গবাক্ষ, তোমরা উঠে দাঁড়াও আমি জাম্ববান সখাকে উপবিষ্ট করাই।"

"এই যে আসুন, আসুন"—বলিয়া হাসির মধ্যে চারজন উঠিয়া দাঁড়াইল।

লোকটি খুব অপ্রতিভ হইয়া গিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিল—"আমায় কেন? আমায় ছাড়ান্ দেন্, আমি গরীব চাষাভূষো মানুষ, আপনাদের সঙ্গে বসবার যুগ্যি নয়—"কিন্তু কোন ফল হইল না, যত আপত্তি ততই বেশী হৈ-চৈ-এর মধ্যে তাহাকে তুলিয়া উপরে বসাইয়া দিল খুড়ো, নিজেও পাশে বসিল। নানারকম ভাঁড়ামি লাগাইয়া দিল। লোকটির বয়স হইয়াছে, তাহার উপর একেবারে হেলো চাষা নয়, সম্ভ্রম জ্ঞান আছে, প্রথমটা হাসিয়া কাটাইবার চেষ্টা করিল, তাহারা রাগিয়া গেল। তাহাতে ভাঁড়ামি, আর সেই সঙ্গে হাসির মাত্রা আরও গেল বাড়িয়া, খুড়ো একটু তফাতে ছিল একেবারে গায়ে এলাইয়া পড়িয়া বলিল—"একি সখা, এত বিরূপ কেন? আহ্! সখার গা কি মোলায়েম, যেন তুলোর বস্তায় শুয়ে আছি, সখা আবার ইণ্টার ক্লাসকে ফার্স্ট ক্লাস করে দিয়েছেন। এমন না হলে আর সখা! আহ্!"

লোকটা রাগিয়া একটু সরিয়া বসিতে খুড়ো সরিয়া গিয়া আরও

চাপিয়া বসিল। ফল নাই জানিয়াও আমি নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় আবার বলিলাম—'মশাই আপনাদের কি একটা সীমাজ্ঞানও নেই? দূরে দূরে যা হচ্ছিল, হচ্ছিল—একেবারে গায়ে পড়ে…একটা বয়স্থ লোক…"

খুড়ো আমার দিকে চাহিলও না,—ঘাড়টা ঘুরাইয়া লোকটির একেবারে মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া যাত্রার ঢং-এ বলিল—"সখা কি দেহরক্ষীকেও সঙ্গে করে এনেছ?"

প্রবল তোড়ে আবার একটা হাসি উঠিল। অনেকে এবারে সোজা-সুজিই আমার পানে ফিরিয়া চাহিল।

একজনকে স্বপক্ষে পাইয়াই বোধ হয় লোকটি আরও চটিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে যাইতেছিল, খুড়ো দুইটা হাত চাপিয়া ধরিল, বলিল—"একি সখা। তা কি হয়?" তাহার পর হাত দুইটা ধরিয়াই একটু ঘুরিয়া পিঠ দিয়া চাপিয়া বলিল—"অমন উলট গাও কেন বাবা? গাড়ির জন্ত ভাড়া দিচ্ছি, না হয় তোমাকেও ভাড়া দেব—এমন নরম ঠেস দেওয়ার গদি আমি ছাড়ব না…আহ্ তোমরা একটু ধরে থেকো গো সখাকে, কেউ একটা সিগ্রেট ছাড়ো দিকিন।"

ব্যাণ্ডেল স্টেশন আসিয়া গেছে। লোকটি নিরুপায় হইয়া বসিয়াছিল, বলিল—"এবার আমায় ছেড়ে দিন, নামবো।"

"মাইরি প্রাণ!"—বলিয়া খুড়ো সোজা হইয়া বসিল, নূতন হাসির হররার মধ্যে বলিল—"আমি গুছিয়ে টেস দিয়ে বসে সিগারেটটি ধরাব ভাবছি, আর তুমি বেরসিকের মতন নেমে যাবে? মাইরি!"

প্লাটফর্মে ঢুকিয়াছে গাড়ি। লোকটা ফতুয়ার পকেট থেকে একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট বাহির করিয়া বলিল—"এই দেখুন না মশাই, মিথ্যা কইব কেন?"

খুড়ো হাতে টিকিট লইয়া পড়িতে পড়িতে যেন অজ্ঞান হইয়া যাইবার মতো হইয়া পড়িল, অতি ক্ষীণ অভিনয়ের স্বরে বলিল, অ্যাঁ! সত্যই সখা জাম্ববান চললেন আমার! অ্যাঁ!—"

লোকটা প্ল্যাটফর্মে নামিয়া একরাশ অশ্রাব্য গালাগালি দিতে দিতে চলিয়া গেল। তাহাতে আরও একটা প্রবলতর হাসি উঠিল মাত্র। থামিলে খুড়ো বলিল—একটু চটে না গেলে জমে না। তা হঠাৎ নেমে গেল যে বেটা ঠিক জমে ওঠবার মুখটিতে—"

আমার পানে একটা আড়ে কটাক্ষ করিল; তাহার পর উঠিতে উঠিতে বলিল—"আমি এবার যাই ও গাড়িতে—তোরা থাক লক্ষ্মীটি হয়ে! বখামি না করে বরং কিছু তত্ত্বকথা শোন, পরকালে কাজ দেবে।"

আর একবার আমার দিকে কটাক্ষ হানিল। একটা তুমুল কলরব উঠিল, কয়েকজন ধরিয়াও ফেলিল—"না খুড়ো, তুমি গেলে চলবে না, তুমি গেলে আমরা অনাথা হব খুড়ো!…একি বাবা, নিজেও শেষকালে উল্টো গাওনা ধরলে!—দর বাড়াচ্ছ কেন খুড়ো?…"

খুড়ো হাসিয়া বলিল—"না রে, আমার কাছে সব—টাকা কড়ি, টিকিট বিলকুল বুড়ো আমার কাছে রেখে দিয়েছে, এমন কি ওদের সেকেণ্ড ক্লাসের পাঁচখানা পর্যন্ত।"

পকেটে ব্যাগটা বাজাইয়া দিল।

সবাই আবার চিৎকার করিয়া উঠিল—"ব্যাগ কি তোমার আমরা কেড়ে নিচ্ছি?…সে হবে না খুড়ো…এই তো পাশের গাড়িতে রয়েছে বাপ।"

খুড়ো যেন জালাতন হইয়া পড়িবার ভান করিয়া হাসিয়া বলিল—

—"তোরা বুঝছিস না, খুড়ো ওদিকে হেছছে;—ও-গাড়িতেও এক মেড়োকে নিয়ে ছিব্যি জমিয়ে আনছিলাম, তোরা মাঝখানেই গিয়ে…।"

কলরবটা বাড়িয়া উঠিল—"তুমি ঠিক দর বাড়াচ্ছ খুড়ো…আমরা সত্যাগ্রহ করব !…"

আমি ভাবিয়াছিলাম বরকর্তাকে গিয়া বলিব; সেও এই দলের দেখিয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় নিতান্ত হন্তদন্ত হইয়া একটি লোক দোরের হ্যাণ্ডেলটা ধরিয়া ব্যস্ত মিনতির স্বরে বলিল—"বাবুরা একটু জায়গা দিন, আমি দাঁড়িয়েই থাকব।"

আমি অপরিসীম বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। …লোকটার কপালে তিলক, নাকে একটি রসকলি, গলায় তুলসীর কণ্ঠি; নিচে বোধ হয় একটা পিরান আছে, তাহার উপর একটা মোটা মটকার চাদর জড়ানো, পায়ে কটকী চটি।…

দরজার কাছে যে দাঁড়াইয়া ছিল, ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"কি খুড়ো?"…

খুড়ো ভিতরের দিকে ছিল, চোখ টিপিয়া ঘাড়ে একটা ঝাঁকানি দিল, তাহার পর চাপা গলায় বলিল—"আরে আসতে দে বেটা,—বোষ্টম বাবাজি না হলে চটিয়ে সুখ !…"

"আসুন বাবাজি! আসুন, আসুন! কি সৌভাগ্য আমাদের আজ! আসুন-আসুন!"—বলিতে বলিতে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে দুই হাত প্রসারিত করিয়া আগাইয়া গেল।

আমি একটি নিঃশ্বাস মোচন করিলাম এবং এতক্ষণ পরে আমার মুখেও একটু হাসি দেখা দিল। হুইসিল দিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

লোকটি উঠিয়া একবার অবোধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিয়া লইল,

তাহার পর অপ্রতিভভাবে একটু হাসিয়া গাড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, খুড়ো তাহার হাত দুইটা ধরিয়া গভীর মিনতির স্বরে বলিল--"ওকি প্রভু, আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা কি করে বসব ?—আসুন, আধ আঁচরে বসুন..."

লোকটি আরও অপ্রতিভভাবে হাসিয়া বলিল—"না বাবুরা, আপনাদের সাথে কি আমি বসতে পারি ? আমার টিকিসও থাট্ কেলাসের..."

খুড়ো সবার দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"ওগো, তোমরা সবাই শোন, প্রভুর আমার থাট্ কেলাসের টিকিস্ !—থাট্ কেলাস ! থাট্ কেলাস !..."

কলরবের মধ্যে একজন গলা উঁচাইয়া বলিল—"আমাদের সব টিকিট প্রভুকে সমর্পণ করলাম, উনি আসুন।"

একটা নারকীয় কলরব উঠিল—"হ্যাঁ, আসুন !...প্রভুর ভাবনা কি ?—পাঁচখানা সেকেণ্ড ক্লাস, কুড়িখানা ইণ্টার ক্লাস টিকিস্ প্রভুর শ্রীচরণে নিবেদন করছি !...আমরা বেঁচে থাকতে প্রভুকে কে কি বলবে ?..."

খুড়োও জোর দিল, আরও দু'একজন সাহায্য করিল, টানিয়া ঠেলিয়া লোকটিকে একটা কোণে, সবচেয়ে ভালো জায়গাটিতে আনিয়া বসাইল। খুড়ো একেবারে পাশটিতে বসিল।

আবার সেই ব্যাপার চলিল। আগেকার লোকটির মতো না হোক, তবুও বেশ গোলগাল চেহারা লোকটির ; খুড়ো বাহু কাঁধ টিপিয়া টিপিয়া বলিল—"আহ্, কি নরম !—মালপো সাঁটিয়ে সাঁটিয়ে প্রভুর আমার সমস্ত শরীরখানি মালপো হয়ে উঠেছে ! কোথায় আশ্রমটি প্রভুর ? গিয়ে দিন কতক থাকতে হবে।"

"আমাদেরও সঙ্গে নিয়ো খুড়ো ··মালপো আর মালসাভোগ !"

লোকটা কিন্তু চটার ধার দিয়াও যাইতেছে না, অমন করিয়া ঠেলিয়া আনার মধ্যেও নয়, টীকাটিপ্পনীর মধ্যেও নয়। সেই মৃদু হাসি আর অপ্রতিভ দৃষ্টি লইয়া সত্যই বৈষ্ণবোচিত বিনয়ের সঙ্গে বসিয়া আছে। বলিল—"মালপো মালসাভোগ কোথায় পাব বাবুরা? গরীব গেরস্ত মানুষ—আমি আশ্রমই বা কোথায় পাব—মালপোই বা কোথায় পাব ?..."

খুড়ো হঠাৎ সরিয়া বসিল, বেঞ্চের উপর পা দুইটা তুলিয়া লোকটির গায়ে পিঠ দিয়া কীর্তনের ঢঙে গাহিয়া উঠিল—"ওগো এই সেই আশ্রম পেয়েছি! এই সে আমার শ্যামের কুঞ্জ—এই সে আশ্রম পেয়েছি··· আমি নড়ব না গো···আমায় একটু তোরা গুড়ুক দেগো—আমি নড়ব না গো!···"

নারকীয় উল্লাসের মত তিন চারজন সিগারেট আর দেশলাই বাড়াইয়া ধরিল। খুড়ো একটা ধরাইয়া, ধুঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আঁকর জুড়িয়া জুড়িয়া গাহিতে লাগিল—"হও যদি নিঠুর প্রিও, তোমার কুঞ্জের ভাড়া নিও; আমি নড়ব না গো···তুমি কড়ায়-গণ্ডায় চুকিয়ে নিও···আমি না ছোড়ব এ মিলন কুঞ্জো—ও-ও-ও!···"

লোকটি কোণ-ঠাসা হইয়াই ছিল, যতটা পারিল আরও গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিল। খুড়ো পিঠ দিয়া আরও চাপিয়া ধরিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া কীর্তন গাহিতে লাগিল। কোন রকমে চটাইবার চেষ্টা; বুঝিতে পারিতেছে ভাঁড়ামিতে একঘেঁয়েমি আসিয়া পড়িতেছে, না চটাইলে হাসির খোরাক জোগানো দুষ্কর হইয়া উঠিবে। দু'একবার আমার পানেও চাহিল, বেশ বুঝিতেছি অভাবে যদি আমিই চটি তো

এবার আমায় লইয়া পড়িতে ওর বাধিবে না। আমার আর সে সুযোগ দিবার প্রয়োজন নাই, চুপটি করিয়া নিজের জায়গায় বসিয়া দেখিতে লাগিলাম।

গাড়ির দৌড়টা এবার বড়, ব্যাণ্ডেল ছাড়িয়া একেবারে বর্ধমানে থামিবে। মিলন হইল, মাথুর হইল, খুড়ো কখনও সাজিল রাধা, কখনও সাজিল বৃন্দা, শ্রীকৃষ্ণের নাক টিপিয়া, দাড়ি ধরিয়া অত্যাচারের চূড়ান্ত করিল। শেষে "তোর পীত ধড়া কেড়ে লব···!" বলিয়া তান ধরিয়া নটবর চাদরের খানিকটা পর্যন্ত টানিয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইয়া লইল। স্টেশনের পর স্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে। এদিকে হুল্লোড়ের এতটুকু বিরতি নাই। লোকটা কিন্তু চটিল না, সেই একভাবে, অসীম ধৈর্যে গুটাইয়া বসিয়া রহিল, মাঝে মাঝে শুধু একটা মিনতি, একটা বিনয়—"আমাকে নিয়ে কেন?—আমি আপনাদের পায়ের ধূলোর যুগ্যিও নয়, গরীব বোষ্টম···"

আমি দৃষ্টি যতটা সম্ভব সূক্ষ্ম করিয়া লইয়া নিজের কোণটিতে বসিয়া দেখিয়া যাইতেছি। হ্যাঁ, ধৈর্য্য বলিতে হয়তো এই একেই!

সেরামপুর থেকে বর্ধমান—হাসি ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছে, এর পরে বোধ হয় চাদরটা একেবারে টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য রসিকতা খুড়োর হাতে ছিল না; কিন্তু সেটুকু বাকি রহিয়া গেল। বর্ধমান আসিয়া গেল, এবং বাবাজি অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে চাদরটা ছাড়াইয়া লইয়া নিজের গায়ে জড়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এইখানে নামিয়া তাহাকে কাটোয়ার গাড়িতে চড়িতে হইবে। একটা খুব হৈ হৈ হইল আবার—খুড়ো চিৎকার করিয়া ঘন ঘন মূর্ছা যাইতে লাগিল, অন্য সবাই মিনতি করিয়া, জোর করিয়া বাবাজিকে ধরিয়া রাখিবার অভিনয় করিল,

তাহারই ভিতর একই ধরণের হাসি লইয়া বিনয়বচন আওড়াইতে আওড়াইতে লোকটা নামিয়া প্ল্যাটফর্মের ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল।

আমি আমার স্যুটকেশটা লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়াছিলাম, ধরিলাম গিয়া একেবারে বাহিরে, যেখানে ঘোড়ার গাড়িগুলা দাঁড়ায়। বলিলাম—"তোমার সঙ্গে একটা দরকারি কথা আছে, একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে।"

লোকটা এরই মধ্যে বেশভূষা অনেকটা বদলাইয়া ফেলিয়াছে, থতমত খাইয়া একটু মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "আমায় বলছেন? কেন?" বলিলাম—"সেটা এখানে বললে ভালো হবে কি?"

একটু বিস্মিতভাবে চাহিল, বলিল—"বাঃ, কেন মশাই? আপনাকে তো চিনি না।" কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল। আমি সদর রাস্তায় একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন আধ-অন্ধকার জায়গায় গিয়া দাঁড়াইলাম; নির্জন, অথচ ডাকিলেই লোক জোটান যায়।

বলিলাম—"তুমি আমায় চেন না, কিন্তু আমি চিনি,—এর আগে তোমায় দেখি ধানবাদে, একটি সোনার ঘড়িসুদ্ধ্য রেলওয়ে পুলিস তোমায় প্ল্যাটফর্ম দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; তিন বছর আগেকার কথা..."

লোকটা আবার উল্টা চাপ দিবার চেষ্টা করিল—"বাঃ, তুমি ভদ্রলোক সেজে রাহাজানি করবার মতলবে আছ—ভয় দেখিয়ে?—বাঃ, এক্ষুণি আমি লোক জড় করব..."

বলিলাম—"তা করবে না, ভয় নিজেরই আছে তোমার। তোমার পকেটে কুড়ি খানা ইণ্টার ক্লাস পাঁচখানা সেকেণ্ড ক্লাস আর বাহাত্তরটি

নগদ টাকাসুদ্ধ একটা ব্যাগ আছে ; যাদের ব্যাগ, তাদের গাড়ি এখনও ছাড়েনি—ডাকবে লোক ? তাহলে আর আমায় কষ্ট করে চেঁচাতে হয় না।

লোকটা হাঁ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

বলিলাম—"ভয় নেই ; আজ কিছু বলছি না, তবে ব্যাগটি বের করো। আজ হজমটা আর করতে পারবে না, বাজে মেহনৎ গেল। নাও চট্-পট্ ; আমায় সত্যিই কাটোয়া লাইনে যেতে হবে।"

ব্যাগটা বাহির করিল। তাহার পর মুখের পানে একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল—"আধা-আধি…আসুন…যখন ভাই বেরাদারির মধ্যেই…"

ব্যাগটা লইয়া দশ টাকার একটি নোট হাতে দিয়া বলিলাম—"এটা তোমার ভাড়া, বাকিটা আর একজনকে পাঠাতে হবে। পিঠে ঠেস দেওয়ার জন্মে বলছিল না ভাড়া দেবে ? তা এই তোমার ভাড়া…যাও এবার লক্ষী ছেলেটির মতন…"

•

বাহাত্তর টাকার কথাটা ভাঁওতা আমার, গুণিয়া দেখিলাম বোধ হয় রাহাখরচ ইত্যাদি বাবদ তেত্রিশ টাকা তেরো আনা পয়সা রহিয়াছে। পরদিন মনিঅর্ডার করিয়া বাকি টাকাটা হৃদয়নাথ মালাকারের কাছে পাঠাইয়া দিলাম—গ্রাম বাসুলী, পোস্ট আফিস বংশবাটি, জেলা হুগলি।

তবু এখনও গায়ের জ্বালা মেটে নাই ; অনুতাপ হওয়া তো পরের কথা।



ও-টি-আর'এর একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী আসিতেছে গোরক্ষপুরের দিক থেকে। ভিড় যথেষ্ট আছে, তবে প্রথম শ্রেণীর কামরাটা একেবারে খালি, মাত্র আমি আছি আর একটি ইংরাজ যুবতী; ইংরাজ বলিয়াই যুবতী বলিলাম, বয়স প্রায় সাতাশ আটাশ হইবে। গোটা-দুই স্টেশন একত্রে আসার পর তিনি একটু গল্প-প্রবণ হইয়া উঠিলেন।

অনেকগুলি কারণ ছিল; প্রথমত অন্য সঙ্গীর অভাব, দ্বিতীয়ত আমি সামরিক পোষাক পরিহিত, সুতরাং অতটা অপাঙ্‌ক্তেয় নই,

কুইন্ট ইণ্ডিয়া

তৃতীয়ত, যাহা কথাবার্তায় টের পাইলাম, তিনি সদ্য বিলাত হইতে আসিয়াছেন, এদেশটা সম্বন্ধে কৌতূহলও টাটকা আর এখনও কৃষ্ণবিদ্বেষটা উগ্র হইতে পায় নাই। নাম বলিলেন মিস্ ফ্লোরা গ্রেস্। ছাপরার কাছাকাছি একটা জায়গায় কে একজন মিস্টার ট্রেভার কিছু জমিদারি এবং কৃষিসম্পত্তি লইয়া আছেন, তাহারই সাক্ষাৎকারে যাইতেছেন।

মিস্ গ্রেস্ নিজে মাস কয়েক হইল দেরাছুনের নিকটবর্তী কোন একটি জায়গায় একটি ইংরাজ বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা লইয়া আসিয়াছেন। মিস্টার ট্রেভার সম্প্রতি সেখানে শৈলবিহারে গিয়াছিলেন, আলাপ হয়, নিমন্ত্রণ রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

অর্থাৎ কোর্টশিপ চলিতেছে। আন্দাজের কথাটা আমিই বলিলাম, তবে অত স্পষ্ট করিয়া নয়। একটু হাসিয়া বলিলাম—"মিস্টার ট্রেভারের সৌভাগ্যে তাঁকে অভিনন্দিত করছি যে, এই নিদারুণ গ্রীষ্ম অগ্রাহ্য করে আপনি তাঁর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন।"

মিস্ গ্রেসের হাসিতে একটু লজ্জা জড়াইয়া পড়িল, বলিলেন—"কিন্তু আমি তাঁর সৌভাগ্যকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পাচ্ছি না মিস্টার মুখার্জি—যদি সৌভাগ্যই হয় সেটা,—উঃ, কী অসহ্য গরম—নরক একেবারে!"

সত্যই অসহ্য গরম। জুন মাস, তায় সময়টাও দুপুরের কাছাকাছি: পাখা চলিতেছে—কে যেন অদৃশ্য আগুন লইয়া দেয়ালীর আঁজি-বাঁজি খেলিতেছে। বলিলাম—"কিন্তু মিস্টার ট্রেভারেরই তো এই সময় শৈলনিবাসে থাকা উচিত ছিল, তা না করে আপনাকে সুদ্ধ এই অগ্নি-পরীক্ষায় টানলেন যে?"

মিস্ গ্রেসের মুখটা গম্ভীর হইয়া গেল, জানালার দিকে ফিরাইয়া লইয়া নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিলেন। বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম, কিছু বেফাঁস হইয়া গেছে নাকি? অথচ আসল যেখানে ঠাট্টা করিলাম সেখানে তো বিরক্তির কোন লক্ষণই দেখা গেল না, বরং ইঁহারা বেশ সময়মত ঠাট্টাগুলা যেমন প্রীতিভরেই গ্রহণ করেন, সেইভাবেই করিলেন গ্রহণ। কিছু বলিয়া সামলাইতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় মিস্ গ্রেস্ মুখটা আবার ফিরাইয়া আনিলেন।

রাগ নয়—কপট রোষের অভিনয় করিয়া বলিলেন—"শুনুন মিস্টার মুখার্জি, সত্যি কথাটা যদি বলতেই হয়, এর জন্যে দায়ী আপনারাই।"

একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম—"কি করে তা জানতে পারি কি?"

"সব দিক দিয়েই, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আমরা আপনাদের যা শান্তি আর স্বচ্ছন্দতা দিয়েছি, তার বদলে আপনারা আমাদের শান্তি হরণ করতে বসেছেন। বেশি দিনের কথা নয় যে আপনাদের স্মৃতিপথ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে,—এই কিঞ্চিদধিক শ' দেড়েক বৎসর—একবার ভেবে দেখুন কি অবস্থা ছিল এই দেশের—যুদ্ধ বিগ্রহে দেশ ছিন্নভিন্ন, প্রতিটি রাজদরবার চক্রান্তের কেন্দ্র, রাস্তাঘাট নেই বললেই চলে, যা বা আছে দিনে ব্যবহারের জন্যও নিরাপদ নয়, যানবাহন সেই আদম ঈভের সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—আপনারা যে জগতের সর্ব পুরাতন জাতিদের অন্যতম একথা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু যে-অবস্থায় আপনারা ছিলেন, তখন তাতে আফ্রিকা বা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিদের চেয়ে খুব বেশি প্রভেদ ছিল না। এর জায়গায় আমরা কি দিয়েছি একবার ভেবে দেখুন মিস্টার মুখার্জি—শক্তিমান কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত করে প্রথমত দরবারে দরবারে চক্রান্ত আর পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের নিরসন করেছি। রাস্তাঘাট এখন সুগম এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ, যানবাহনে আপনারা বোধ হয় পৃথিবীর সভ্যতম জাতির সমকক্ষ—সভ্যতা আর কৃষ্টির দিক দিয়েও দেখুন—আমাদের প্রবর্তিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট আপনাদের কবি, বৈজ্ঞানিক জগতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার নোবেল প্রাইজ পর্য্যন্ত অর্জন করে নিয়ে এসে আপনাদের দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। অল্লাধিক দেড় শতাব্দীর ব্যবধানের ভারতবর্ষের এই দুটি রূপ, অথচ আজ আপনারা এইভাবে

তোয়ের হয়ে নিযে আমাদেরই ফ্রন্টে বলছেন—'কুইট ইণ্ডিয়া!' আমাব রূঢ়তাটা মাপ করবেন মিস্টাব মুখার্জি, কিন্তু আমি একটা কথা জিগ্যেস করি—অকৃতজ্ঞতা কি এর চেযে বেশি দূর যেতে পারে?"

দেখিলাম সংযমের জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও মিস্ গ্রেস্ উত্তেজিত হইযা উঠিযাছেন। বেশ একটু ফাঁপরে পড়িলাম—স্ত্রীলোক, তায গাড়িব মধ্যে নিঃসঙ্গ, ওঁর বাঁধা গতের মত তর্কগুলাব উত্তব দিতে তো পাবিলাম না, এমন কি নোবেল প্রাইজ পাওযা লইযা যে সাংঘাতিক ভ্রান্ত ধারণা রহিযাছে সেটাও দূব কবিতে কেমন যেন একটা দুরূহ সংকোচ বোধ হইল। ঠাণ্ডা করিবার জন্যই বলিলাম—"একটা জাত স্বাধীনতাব জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে মিস্ গ্রেস্—তাদেব দোষ ত্রুটি বা আতিশয্যগুলো আপনাদের মতো স্বাধীনতাপ্রিয মানুষেব একটু ক্ষমার চক্ষেই দেখা উচিৎ নয় কি?"

মনটা বোধ হয একটু ভিজিযা থাকিবে, কেননা মিস্ গ্রেস্ আবম্ভ করিলেন একটু নরম সুরেই, কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গে আবাব সেই রকম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন—হয়তো একটু বেশিই, বলিলেন—"তর্কেব খাতিরে আপনার কথাটা মেনে নিলেও এটা আপনাকে খোলাখুলি জানিয়ে দেওয়াই ভালো মনে করি মিস্টাব মুখার্জি যে, আপনারা একটা ধুয়ো তুলেছেন বলেই যে আমরা এ-দেশ ছেড়ে চলে যাব এটা আপনারা যেন স্বপ্নেও না ভাবেন। আপনাদের গলাব জোর থাকতে পারে কিন্তু তর্কের মধ্যে কোন জোরই নেই। আর আমাদেব জাত যদি কোন জিনিসকে মর্যাদা দিতে অভ্যস্ত থাকে তো তা তর্কেব সারবত্তা, কণ্ঠেব শক্তি নয়। কণ্ঠশক্তি নিযোগ করাব মধ্যে একটিমাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে মিস্টার মুখার্জি, ভয দেখানো, যে জাত নিজের শক্তি আব

অধ্যবসায়ের গুণে অর্ধেক পৃথিবীতে তার উপনিবেশ স্থাপন করলে সে কি এতই ভয়প্রবণ যে আপনাদের গলাবাজিতেই তাদের অধিকার ছেড়ে পালিয়ে যাবে?"

একটু না টুকিয়া পারিলাম না, তবে যতটা সম্ভব রমণীশ্রুতির উপযোগী করিয়াই বলিলাম—"মাপ করবেন মিস্ গ্রেস্—পৃথিবীতে আপনাদের সবচেয়ে বড সাম্রাজ্য। জাতি হিসাবে সবচেয়ে বড় বিধানদাতা (Lawgiver) বলে আপনাদের একটা খ্যাতিও আছে—তাই জিগ্যেস করছি অধিকার জিনিসটা এলো আপনাদের কোথা থেকে। আপনি বিদুষী, অধিকারের মূলে যা যা থাকে তা তো নিশ্চয় আপনার অজ্ঞাত নয়..."

উল্টা ফল হইল, মিস্ গ্রেস্ এক রকম অসংযত হইয়াই উঠিলেন, মুখ একেবারে সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধরও মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, যে তর্কের সারবত্তার ওপর এত শ্রদ্ধা তাহার ধার দিয়াও না গিয়া বলিলেন—"দেখুন মিস্টার মুখার্জি, অধিকার সম্বন্ধে পাঠ আমাদের অন্যের কাছ থেকে নিতে হবে না, সে জ্ঞান আমাদের যথেষ্টই আছে এবং আমাদের অধিকার কি করে রক্ষা করতে হয় তা আমরা ভালো রকমই জানি। তাহলে কথাটা আরও একটু স্পষ্ট করেই বলি—মিস্টার ট্রেভার আর আমার মধ্যে বাগ্দান হয়ে গেছে। কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট ফিরে আসায় আবার 'কুইট ইণ্ডিয়া' রব ওঠায় এবং আপনি যে ঐ অধিকারের কথা বললেন, সে প্রশ্ন নিয়েও চারদিকে গুলতান ওঠায় তাঁকে তাড়াতাড়ি এই অগ্নিকুণ্ডে নিজের জমিদারিতে ফিরে আসতে হয়েছে। আশা ছিল যুক্তির জয় হবে, তা তাঁর যে কখানি চিঠি পেয়েছি তার প্রত্যেকটিতেই এই খবর যে, অবস্থা দিন দিনই খারাপ হয়ে উঠছে। শেষে আমি

পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে এই চলেছি। কেন তা আন্দাজ করতে পারেন ?”

দীর্ঘ উচ্ছ্বাসে বেশ বিপর্যস্তই হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম—“আজ্ঞে না, কৈ আন্দাজ করতে পারছি না তো কিছু।”

অর্থাৎ এবার ভালোমন্দ কিছুই বলিলাম না, যদি এভাবেই উত্তাপটা কমে। কিছু না। মিস্ গ্রেস্ এবার দৃষ্টিতে খানিকটা শাসনের ভাব মিশাইয়া বলিলেন—“ইংরাজ রমণী হিসাবে আমি তাঁর বিপদে তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে যাচ্ছি মিস্টার মুখার্জি, কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটা সঙ্কল্প নিয়ে—যদি তিনি ভয়ে বা অন্য কোন কারণে এদের অন্যায় আবদারে নিজের অধিকার ছেড়ে সরে দাঁড়ান তো তাঁকে আরও একটি জিনিসের মায়া ছাড়তে হবে…”

মিস্ গ্রেস্ আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—“অর্থাৎ আমার; আমি যাচ্ছি, হয় আমাদের এনগেজমেণ্ট দৃঢ় করে আসব, নয় একেবারেই চিরতরে ভেঙে দিয়ে আসব। ভীরুতাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় আমি অভ্যস্ত নই। আপনাদের অধিকার আমাদের চেয়ে যে বেশি, তা সাব্যস্ত করতে হলে আমরা খুব বিশ্বাসজনক প্রমাণ চাই মিস্টার মুখার্জি; যদি মনে করেন, মুখে ‘কুইট ইণ্ডিয়া’ বললেন, আর আমরা তল্পি-তল্পা বেঁধে…”

এমন সময় গাড়িটা একটা স্টেশনে আসিয়া পড়িল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের কামরায় যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। গাড়ির দুই পাশে দোর-জানালা দিয়া দুইটা যাত্রিদল পিল পিল করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়া গাড়িটা একেবারে ভর্তি করিয়া ফেলিল—কেহ নিজের শক্তিতে উঠিল, কাহাকেও ভিতর থেকে টানিয়া তুলিল, কাহাকেও বাহির হইতে ঠেলিয়া তুলিল; নানা রকমের ছোটবড় জিনিসপত্র আসিয়া যেখানে

সেখানে পড়িতে লাগিল এবং মিনিট দুয়েকের মধ্যে অমন যে খালি কামরাটা তাহাতে তিল ফেলিবার ঠাঁই অবশিষ্ট রহিল না। ছোট স্টেশন, ইতিমধ্যে ট্রেনটা হুইসিল দিয়া ছাড়িয়া দিল এবং গোলমাল যে হইতেছিল, সেটাকে ছাপাইয়া ভিতর এবং বাহির থেকে একটি চিৎকার উঠিল—বর ওঠেনি—বর ওঠেনি!...বর ছেড়ে গেছে!..."

কয়েকজন দুইধার থেকে এলার্ম চেন টানিয়া ধরিল এবং গাড়িটা ভালো করিয়া থামিবার পূর্বে দুই দিকের জানলা গলিয়া দুইটি বর দুই দিক হইতে হাতে-হাতে, পাঁজায়-পাঁজায় গাড়ির মাঝখানে আসিয়া পড়িল। গাড়ি আবার ছাড়িতে যেটুকু বিলম্ব হইল তাহাতে সবাই আরও কতকগুলা লোককে গাদিয়া গাদিয়া দুই দিক হইতে চালান করিয়া দিল।

মিস্ গ্রেস্ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেছেন; খানিকটা যে ভীতও, সেটা বেশ বোঝা যায়।" অত যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, মুখে একেবারে রা নাই। শুধু বিস্ফারিত নেত্রে সব দেখিয়া যাইতেছেন। ভিড় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁহাকে কোণের জায়গাটিতে বসাইয়া নিজে পাশে বসিয়াছি এবং মাঝখানে আমাদের দুইজনের সুটকেস রাখিয়া একটা অন্তরালের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছি। এতক্ষণ ভিতরের ব্যাপারই লক্ষ্য করিতেছিলেন, গাড়িটা একটু অগ্রসর হইলে একবার বাহিরের দিকে মুখ বাড়াইয়া ত্রস্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—মিস্টার মুখার্জি, একবার বাইরে চেয়ে দেখুন! এ কি! এমন দৃশ্য তো জীবনে দেখিনি!..."

গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও কতকটা অভিনব বটেই। গাড়ির পা'দানে আগে থাকিতেই বেশ কিছুটা লোক ছিলই—আগাগোড়া—এখন সেখানেও রীতিমতো ভিড়, তাহার উপর

যা সমস্ত দৃশ্যটাকে আরও দর্শনীয় করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ভিড়ের গায়ে বিলম্বমান নানারকম বাজনা—ঢাক, জয়ঢাক, বড় বড় করতাল, ক্ল্যারিয়নেট, কর্নেট আরও সব জটিল বিলাতি বাজনা; ব্যাগপাইপ, দেশী ঢোল, ঢাক, সানাই, রামশিঙা—রকমারি ব্যাপার একেবারে!—আমাদের গাড়ির দুই দিকে একেবারে দুই-তিনখানা গাড়ি পর্যন্ত। ওদিকেও নিশ্চয় এই অবস্থা। আর এই সমস্তর উপর ছাপরা জেলার জুন মাসের ভরা দুপুরের রোদ যেন ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ভিতরেব হাওয়াই আগুনের হল্কা।

মিস্ গ্রেস্ সেই রকম বিমূঢ় দৃষ্টিতেই চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কিছু ঠাহর করতে পারছেন?—যেন মিলিটারী ব্যাণ্ডের মতো দেখাচ্ছে, মতলবখানা কি ওদের?"

বেশ বোঝা যায়, আগস্ট বিদ্রোহের আতঙ্কের সুর রহিয়াছে কণ্ঠে। বলিলাম—"না অন্য ব্যাপার কিছু নয় মিস্ গ্রেস্, এ আমাদের দেশের একটা সাধারণ ব্যাপার—বিবাহ হতে চলেছে। এর সঙ্গে বাজনা-বাদ্যি থাকাটা আমাদের একটা রেওয়াজ; আপনি সবে এদেশে এসেছেন, তাই আপনার নতুন ঠেকছে; দেখবেন মিস্টার ট্রেভার এতে বেশ অভ্যস্ত।"

মিস্ গ্রেস্ স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন, কি বলিবেন যেন, কথা জোগাইতেছে না, শেষে ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিলেন—"এমন অসাধারণ একটা ব্যাপার এখানকার সাধারণ রেওয়াজের মধ্যে মিস্টার মুখার্জি? বলেন কি আপনি? এদের প্রাণশক্তি দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি!—"

আশ্চর্য হইবার তখনও অনেক কিছুই বাকি ছিল এবং এর পর যাহা দেখিলেন, তাহাতে মিস্ গ্রেস্ একরকম বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া বসিয়া রহিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মিস্ গ্রেসের প্রশ্ন করিবার ক্ষমতাই যেন লুপ্ত হইয়া গেল এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও কোন প্রশ্ন করিলে বোধ হয় আমাকেও নিরুত্তরই থাকিতে হইত।

নবাগতদের মধ্যে জায়গা লইয়া খুব একচোট কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। ছাপরা জেলা, কেউ হটিবার পাত্র নয়, বচসা প্রচণ্ডতর হইতে হইতে ক্রমে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল, তাহার পর ওরই মধ্যে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় সবাই একরকম ঠাণ্ডা হইয়া গেল। কতকটা ব্যবস্থাও হইল—ওদিককার বেঞ্চে ওদলের মাতব্বরেরা বরকে লইয়া গুছাইয়া সুছাইয়া বসিল; এদিককার বেঞ্চেও সেই ব্যবস্থা হইল, বাকি সবাই দাঁড়াইয়া রহিল বা মালপত্রের উপর গাদাগাদি করিয়া বসিয়া রহিল, ওরই মধ্যে দুইটা দলের মধ্যে কিন্তু পার্থক্যটা বজায় রাখিয়া চলিল।

আমার পাশেই যে ভদ্রলোকটি বসিয়াছিলেন তাঁহার নিকট হইতে কিছু ভিতরকার খবর জোগাড় হইল। বরপক্ষীয়েরা একই জায়গার লোক, পরস্পরের জ্ঞাতি, জাতিতে রাজপুত। স্টেশন থেকে মাইল ছয়েক দূরে সিমরি গ্রামের জমিদার; একদল নামিবে ছাপরা, একদল সোনপুর। ওদিকে মোটা গোঁফ আর গালপাট্টা সমন্বিত প্রবীণ ভদ্রলোকটি ওদিক-কার বরের পিতা। নাম বাবু গুলজার সিং। ভয়ঙ্কর রাশভারি আর করিয়াদী লোক। এদিক'কার কর্তা বরের বড় ভাই, এই বেঞ্চের যিনি শেষদিকে বসিয়া আছেন—মাথায় বাবরি, গোঁফ অত বড় নয়, তবে

একটা রাজপুতী ঢং আছে, অত্যন্ত রগচটা মানুষ। নাম বলবন্ত সিং।

উভয় পক্ষের মধ্যে তিনপুরুষ ধরিয়া বৈরভাব চলিয়া আসিতেছে।

বলিলাম—"এরকম ফরিয়াদী আর খাপ্পা মেজাজের লোক একদিনেই বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছেন, বৈরিভাবও বলছেন বনেদী, উঠলেনও এক কামরায়, এতে হাঙ্গাম বাধবে নাতো ?"

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া নির্বিকারকণ্ঠে বলিলেন—"সেটা জগদম্বার ওপর নির্ভর করছে। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় গোটাকতক শির ধড় থেকে নামবে, আপনি আমি কি রুখতে পারব বাবুজি ? রাজপুতের বিয়ে—আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন ? প্রায় তো লেগেছিল, জগদম্বার ইচ্ছেয় থেমে গেল তাইতো ? তাঁরই মর্জি হলে আবার বেধে যেতে কতক্ষণ ? দুই কর্তার মুখের ভাবটা একটু লক্ষ্য করুন না !"

সত্যই লক্ষ্য করিবার বিষয়। দুইজনেই বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া আছেন, অত্যন্ত গম্ভীর। ওরই মধ্যে ঘাড় ফিরাইয়া কয়েকবার পরস্পরের দিকে দেখিলেন, বার দুয়েক বোধ হয় চোখোচোখিও হইয়া গেল, তাহাতে মুখ দুইটা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল—ভিতরে খুব উগ্ররকম কোন চিন্তাধারা চলিতেছে।

মেমসাহেব নিথর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছেন, বাহিরে অমন জ্বলন্ত হাওয়া তবু মুখটা এক একবার একটু বাড়াইয়া দৃশ্যটা না দেখিয়া লইয়া যেন পারিতেছেন না। ভীষণতার যে একটা মোহিনী শক্তি আছে সেটা যেন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে। কিছু বলিতেছেন না কিন্তু—নিশ্চয় পারিতেছেন না বলিতে।

অবশ্য গাড়ির মধ্যে উভয় পক্ষ মিলিয়া একটা হৈহল্লা চলিযাছে। তবে সেটা মিশিয়া যাইতেছে না, এদিকে-ওদিকে পার্থক্যটা মোটামুটি

বাহিরে বজায় আছে। মিশিয়া গেলে অর্থাৎ এই অবস্থায় আবার বচসা সুরু হইয়া গেলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে ভাবিতেছি, এমন সময় আমাদের দিকে হঠাৎ কোথায় একটা রামশিঙার আওয়াজ উঠিল। মিস্ গ্রেস্ একরকম চমকাইয়া মুখটা বাড়াইয়া তখনই টানিয়া লইলেন, চক্ষু দুইটি বিস্ময়ে আরও বিস্ফারিত হইয়া গেছে। কিছু একটা প্রশ্ন করিতেন কিন্তু আরও রুদ্ধবাক হইয়া গিয়া যেন পারিতেছেন না। ওঁর কথাটা নিজের হইতেই আমার মনে পড়িয়া গেল—"Mr. Mukherjee, I am surprised at their stamina !"

এর পরেই লক্ষণীয় ছিল দুই বরকর্তার মুখের ভাব। ঘটনাটা আমাদের দিকের, এই অগ্নিবৃষ্টির মধ্যে কেহ রামশিঙায় ফুঁ দিতে পারে এটা বাবু বলবন্ত সিংএর রাজপুতী কল্পনারও অতীত নিশ্চয়, তিনি একবার ঝুঁকিয়া চাহিয়া লইয়া গোঁফে একটু তা দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছাকৃত হইলেও তাঁহার ব্যঙ্গ দৃষ্টির খানিকটা তির্যক রেখায় বাবু গুলজার সিংএর উপর গিয়া পড়িল। তিনি বোধহয় এই রকম একটা কিছু প্রত্যাশাই করিয়াছিলেন, ঘাড় ফিরাইতে একটু চোখোচোখিও হইয়া গেল দুই জনের। সঙ্গে সঙ্গে শুভ্র গুম্ফ আর গালপাট্টার নিচে তাঁহার সুগৌর মুখ-মণ্ডল একেবারে রাঙা হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা দুই দিকের সবাই লক্ষ্য করিল এবং হঠাৎ সমস্ত গাড়িটাতে একটা থমথমে ভাব আসিয়া পড়িল। বাবু গুলজার সিং মুখটা খানিকক্ষণ বাহিরের দিকেই করিয়া রাখিলেন —রাগে ফুলিতেছেন। মেম সাহেব নিশ্চয় অতটা কিছু বুঝিতে পারিতে-ছেন না, রামশিঙার বিস্ময়েই অভিভূত হইয়া আছেন। আমি কিন্তু দুই রাজার লড়াইয়ে উলুখড়ের নসিবের কথা চিন্তা করিয়া ভিতরে ভিতরে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছি—বিশেষ করিয়া এই বিদেশিনীর জন্য।

বাইরের লোক হিসাবে প্রয়োজন হইলে আমার এর মধ্যে পড়িয়া দুই পক্ষকে ঠাণ্ডা করিতে যাওয়া ঠিক হইবে কিনা ভাবিতেছি, এমন সময় বাবু গুলজার সিং গর্জন করিয়া উঠিলেন—"তেওয়ারী!"

—এই প্রথম তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, শুনিবার জিনিস বটে!

ডাকটা সবার কণ্ঠেই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। দরজার কাছে—"গরীব পরবর!" বলিয়া একটা প্রত্যুত্তর হইল এবং একটি লোক ভিড় ঠেলিয়া হন্তদন্ত হইয়া সামনে আসিয়া কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল—যেমনি লম্বা তেমনি আড়ে, মাথায় গোলাপি রঙের বিরাট শাফা, হাতে পেতলে বাঁধানো লাঠি, পাশে ঘুন্টি দেওয়া পাঞ্জাবীর ওপর সোনার তাগার একটা মালা।

এ তরফেও হুকুমের প্রত্যাশায় সবাই বাবু বলবন্ত সিংএর মুখের দিকে চাহিয়াছে।

শ্রাদ্ধটা কিন্তু ওদিক গড়াইল না, সবাই একটু বেশি প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিল। বাবু গুলজার সিং সেই রকম জলদ-গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করিলেন—"এটা বিয়ে হতে যাচ্ছে, না শ্মশানযাত্রা?"

কথাটার তাৎপর্য তেমন বুঝিতে না পারিয়া তেওয়ারী শুধু আর একটা কুর্ণিশ করিয়া বেশ সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

আরও এক পর্দা চড়া সুরে প্রশ্ন হইল—"বাজনদারেরা যদি ছেড়েই গেল তো আমাদের আসবার কি দরকার ছিল—আমার ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছি কি আমায় শ্মশানযাত্রা করাচ্ছ তোমরা?...বলো, কথা কইছ না কেন?..."

তেওয়ারী একবার পিছনে সবাইয়ের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইল এবং সে ও আরও কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল—"বাজনদারেরা তো

এসেছে হুজুর চারটে দল…তাদের আগে চড়িয়ে আমরা তবে উঠেছি… সে কি কথা হুজুর, তাদের না চড়িয়ে আমরা উঠতে পারি কখনও!”

“এসেছে যে তার প্রমাণ কি? বাজনা কোথায়?”

সবাই চুপ করিয়া রহিল, এ অবস্থার মধ্যেও যে বাজনার প্রত্যাশা করে তাহাকে কি উত্তর দেওয়া যায় যেন ভাবিয়া পাইতেছে না। শেষে মোসাহেবগোছের একজন একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল,—“হুজুর, তারা সব এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে কোন রকমে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে, বাজাবার একটু কোনও উপায় থাকলে তারা ছাড়ত না, সে পাত্রই নয় তারা…”

এই সময় রামশিঙায় আর একটা আওয়াজ উঠিল এবং ওদিকে বাবু বলবন্ত সিং নিজের কয়েকজন লোকের উপরই দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া ঈষৎ হাসিয়া গোঁফে একটু চাড়া দিলেন।

বাবু গুলজার সিং মোসাহেবের কথায় গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন,—“এর পরের স্টেশনেই সবাই নেমে যাবে, ফিরে যেতে হবে! তোমরা ভেবেছ গুলজার সিং মরেছে, কিন্তু সেটা তোমাদের ভুল ধারণা বাবা!”

এর পরে আর কিছু বলিলেন না। ভিড়ের ও-অংশে সেই রকম থমথমে ভাবটা লাগিয়া রহিল, শুধু তেওয়ারীকে লইয়া কয়েকজন মাতব্বর একত্র হইয়া কি একটা পরামর্শ অাঁটিতে লাগিল। গাড়ির বেগ কমিয়া আসিল, গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটা স্টেশন আসিতেছে।

গাড়ি থামিলে তেওয়ারী নামিয়া গেল। ছোট স্টেশন, মিনিট দুয়েক থামিল গাড়িটা, চলিতে আরম্ভ করিলে তেওয়ারী আসিয়া আবার উঠিয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে এদিক পানে অনির্দিষ্ট ভাবে এমন একটা

কটাক্ষ হানিল, যাহার অর্থ দাঁড়ায়—'এইবার চলে এসো।' তাহার পর রামশিঙাটি বাজিয়া উঠিতে যা দেরি, সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ওদিকে চারটে দলের যত রকম যন্ত্র থাকিতে পারে—করনেট, ক্লারিওনেট, ব্যাগপাইপ, সানাই, রামশিঙা—সেই অগ্নিবর্ষী আকাশের নিচে একসঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠিল। মিস্ গ্রেসের চোখ দুইটা বিস্ময়ে যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবে, আমার পানে চাহিয়া বলিলেন,—"এযে পুরোদস্তুর সঙ্গীত, মিস্টার মুখার্জি! (This is full-fledged music Mr. Mukherjee !)"

অবশ্য ঠিক সঙ্গীত বলিতে যা বোঝায় তাহার কিছুই নয়—তবে কোন যন্ত্রই বোধ হয় বাদ নাই, সুর-তালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া সবগুলা যেন একটা প্রলয় তাণ্ডবে মাতিয়া উঠিয়াছে।

বাবু বলবন্ত সিংয়ের মুখ দেখিখাম একেবারে ছাইপানা হইয়া গেছে। বাবু গুলজার সিং জলদ-গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"ফর্সী!"

চিলমচি অপেক্ষাই করিতেছিল, তাওয়াদার চিলিম আর গড়গড়ার ব্যবস্থায় মোতায়েন হইয়া গেল।

সমস্ত পথ একটানা ঐ ব্যাপার চলিল। বাবু বলবন্ত সিং একবারও গাড়ির দিকে মুখ ফিরাইলেন না। ক্রোধে, অপমানে, আক্রোশে জলন্ত আকাশের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন। গাড়ির গতিবেগ কমিয়া গেল, স্টেশন আসিল, গাড়ির শব্দ রহিত থাকায় বাজনার ঝঞ্ঝা আরও প্রবল হইয়া উঠিল। বাবু বলবন্ত সিংএর সান্ত্রী একবার গাড়ির ওদিকে দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করিয়া গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িল। গাড়িটা মিনিট দুই-তিন থামিল, বাজনা ওদিকে আরও ঝঞ্ঝাময় হইয়া উঠিল, তাহার পর গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবু বলবন্ত সিংএর সান্ত্রী এক

লাফে আবার গাড়ির উপর লাফাইয়া উঠিল, তেওয়ারীর সেই বিজয় দৃষ্টিকে সুদে-আসলে ফিরাইয়া দিয়া বেশ ঘটা করিয়া মনিবকে একটা কুর্ণিশ করিয়া আবার পাহারায় দাঁড়াইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকের আগে-পিছনের কয়েকটা গাড়ির পাদান থেকেও বিশ-পঁচিশটা বাদ্যের সেই উৎকট ঝন্‌ঝনা।...বোধ হয় সম্বন্ধে আটকায় বলিয়া বাবু বলবন্ত সিং আর 'ফরসী'র ফরমাসটা করিলেন না, তবে গোঁফে চাড়া দেওয়ায় যতটা সম্ভব বিশিষ্টতা ফুটাইবার চেষ্টা করিলেন এবং নিজের সান্ত্রীর দিকে এমন একটি প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিলেন যাহাতে স্পষ্টই বোঝা গেল একটা মোটা বকশিস তাহার কপালে নাচিতেছে।

বাবু গুলজার সিংএর মুখটা আবার আরক্তিম হইয়া উঠিল, বাহিরে... অনেকটা পথ অতিক্রম করিলেন, তাহার পর আবার মেঘমন্দ্রস্বর উঠিল—"তেওয়ারী!"

তেওয়ারী ভিড় চিরিয়া তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল।

"এমন গুঙা (বোবা) বাজনা কোথা থেকে জোগাড় করেছ তোমরা? জবাব দাও, চুপ করে কেন।" সবাই আবার স্তব্ধ হইয়া গেল, এমন কি ও-দলের লোকেরা পর্য্যন্ত।

অর্থটা বোধ হয় ধরিতে না পারায় তেওয়ারী একটু ব্যাকুলভাবে একবার সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল, শেষে সেই মোসাহেব ভদ্রোলোক আবার সাহস সঞ্চয় করিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল, "কেন, আওয়াজ তো হচ্ছে হুজুর। বাজনা তো গুঙা নয় আমাদের।"

কর্তা হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন—"কিন্তু ঢাকঢোলের আওয়াজ কোথায় মশাই? বাজনায় ঢাক নেই, বিয়েতে তো তাহলে কনে না থাকলেও চলে।"

সকলের মুখ আরও অন্ধকার হইয়া গেল।

মিস্ গ্রেস্ আমায় প্রশ্ন করিলেন—"আবার কি চায় ভদ্রলোক ?"

বলিলাম—"বাজনায় ঢাকের অভাব ওকে পীড়া দিচ্ছে।"

"কিন্তু তা কি করে সম্ভব মিস্টার মুখার্জি ?"

সবাই এক হাত—তাও আবার ডান হাতে হ্যাণ্ডেল বা জানালার ফ্রেম ধরিয়া আছে, অন্য হাতে বাঁশী শিঙে ধরিয়া পরিত্রাহি ফুঁ দিয়া যাইতেছে, যো-সো করিয়া দু'একটা আঙুলেই কোন রকমে এক আধটা চাবি টিপিয়া, কিন্তু ঢাক সামলাইবে কি করিয়া ?...উত্তর আর কি দিব ? বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম।

এবার স্টেশনটা খুব কাছে, অল্পের মধ্যে গাড়ির গতিবেগ স্তিমিত হইয়া আসিল। থামিলে দুই সান্ত্রীতে পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ হানিয়া গাড়ি হইতে তড়াং তড়াং করিয়া লাফাইয়া পড়িল।

আমায় এর পরের স্টেশনেই নামিতে হইবে; বেশি দূরেও নয় সেটা। গোছগাছ করিতেছি এমন সময় মিস্ গ্রেস্ যেন দারুণ আতঙ্কে বলিয়া উঠিলেন—"দেখুন! মিস্টার মুখর্জি, এদিকে দেখুন!! ও মাই গড!!"

একটা গাঁটরি মুক্ত করিতেছিলাম, যতক্ষণে মুখ বাহির করিয়া দেখিব ততক্ষণে গাড়িও ছাড়িয়া দিয়াছে, সঙ্গীত আরম্ভ হইয়া গেছে। এবার একেবারে স-ঢাক!

বাহিরে মুখ বাড়াইয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম, একেবারে কল্পনাতীত ব্যাপার! এদিকে আমাদের গাড়ি আর আমাদের পেছনের দুইটা গাড়ির ছাত আর ওদিকে সামনের তিনটা গাড়ির ছাত বোঝাই হইয়া গেছে। ঢাকি সানাইয়ে কর্ণেট রামশিঙেওয়ালা কেহ বাদ নাই।

লোকের উপর বাজনার চাপে ছাত যেন ভাঙিয়া পড়িবে। গাড়ির বেগ যত বাড়িতে লাগিল, বাজনা ততই হইয়া উঠিতে লাগিল উগ্রতর। গাড়ির মধ্যের উত্তাপই বোধ হয় তখন একশ পনের ষোল ডিগ্রী; বাহিরে টিনের ছাতের উপর কত তাহা অনুমান করাও শক্ত…

একবার বেশ খানিকটা বুক পর্যন্ত বাহির করিয়া না-দেখিয়া থাকিতে পারিলাম না। এদিকে তিনটা ছাত আর ওদিকে তিনটা, দু'দিকের এই ছয়টা ছাতে দুইটা দল পরস্পরের দিকে উগ্রদৃষ্টিতে চাহিয়া গলা ফুলাইয়া কপালের শির ফুলাইয়া কাসিয়া ঘামিয়া যেন সঙ্গীতের গোলা দাগাদাগি করিতেছে; আগুনের হল্কার মতো হাওয়াটা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আবার নিজেকে টানিয়া লইলাম।…দেখি বাবু বলবন্ত সিং গোঁফে তা দিতেছেন, বাবু গুলজার সিং শান্ত মর্যাদায় ফরসী সেবন করিতেছেন।

পরের স্টেশনে নামিলাম; কুলি নাই, তবে বরযাত্রীর লোকেরাই ভদ্রতা করিয়া জিনিসপত্রগুলা নামাইয়া দিলেন। কুলির জন্য হাঁকা-হাঁকি করিতেছি, মিস্ গ্রেস্ও ধীরে ধীরে ছোট সুটকেসটি হাতে করিয়া নামিয়া আসিলেন।

বলিলাম—"আপনার তো এখানে নামবার কথা নয়।"

বাজনার লড়াই বিপুল বিক্রমে চলিতেছে, মিস্ গ্রেস্ অন্যমনস্ক হইয়া সেইদিকে চাহিয়াছিলেন, উত্তরে বলিলেন—"আমার এর পরের স্টেশন মিস্টার মুখার্জি; এইখানেই অপেক্ষা করব, মিস্টার ড্রেভারকে টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি কারটা পাঠিয়ে দেবেন।…নিশ্চয় রাস্তা আছে?"

বলিলাম—"রাস্তা তো আছে, কিন্তু…"

মিস্ গ্রেস্ আবার ওই দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছেন, আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"আর জানেন মিস্টার মুখার্জি ?—আমার সঙ্কল্পটাও বদলে ফেলেছি।"

প্রশ্ন করিলাম—"কি রকম ?"

"মিস্টার ট্রেভারকে এদেশ ছাড়তে আমি বাধ্য করব, আর যদি না ছাড়েন তো…"

গাড়ি ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, সঙ্গীত আরও ক্ষিপ্র, ওদিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবেই কথাগুলা এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ আমার মুখের পানে চাহিয়া থামিয়া গেলেন। মিস্টার ট্রেভারকে কেন যে এ দেশ ছাড়িতে বাধ্য করিবেন—অধিকারজ্ঞান হঠাৎ কেন এত শিথিল হইল সে বিষয়ে আর কিছুই টের পাওয়া গেল না।



১

দীননাথ বেগুনী রঙের লুঙ্গিখানি পরিয়া বাহিরের রকে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়া তৃপ্তমনে গড়গড়া সেবন করিতেছিলেন, এমন সময় বাল্যবন্ধু আশুতোষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাশেই একখানি ডেক-চেয়ার, গড়গড়ার নল দিয়া সেইটা নির্দেশ করিয়া দীননাথ বলিলেন—"বসো, তারপর ?—অনেকদিন পরে দেখছি।"

আশুতোষ চেয়ারের পিছনে ঠেকনাটা ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া

জামাইয়ের উপকারিতা

বসিতে বসিতে বলিলেন—"অনেকদিন পরে।...আরে দেখা হচ্ছে এই ঢের ; চাল, নুন, কাপড়, তেলের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতেই দম ফুরিয়ে যায়।...তুমিও তো অনেকদিন যাওনি ও-পাড়ায়।"

দীননাথ হাসিয়া গড়গড়ার নলটা বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"আরে তোমার তো তবু ফুরুবার মতন দম আছে ; আমার আবার ওসবের ওপর ডেলি প্যাসেঞ্জারি।...নাও ধরো।"

আশুতোষ নলটা গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন—"আবার ওটি গছিয়ে দিচ্ছ ?—একে কুঁড়ে বলে বাড়িতে বদনাম আছেই…আসবার সময়ই গিন্নি টুকে দিলেন—তোমায় পাঠাচ্ছি বটে, কিন্তু নিশ্চিন্দি হতে পাচ্ছি না, ঠিক তুমি কোথাও আড্ডা জমিয়ে…"

দীননাথ বাধা দিয়া বলিলেন—"তুমি চিরকালটা ওদিককার ভয় নিয়েই রইলে আশু, আমাদের বদনাম দেওয়ার ভয়টা আর…"

দুই বন্ধুতে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ভিতরকার কথাটা এই যে, আশুতোষের স্ত্রৈণ বলিয়া একটু বদনাম আছে; আসর-আড্ডা জমাইবেন কি, কোনকালেই তাঁহাকে জোর করিয়াও বেশিক্ষণ ধরিয়া রাখা যায় নাই। আশুতোষ হাসিতে হাসিতেই একটু লজ্জিতভাবে বলিলেন—"তোমাদের ঐ এক কথা। আমার হয়েছে এদিকে আস্তাকুঁড়, ওদিকে বড়ঠাকুর—বাড়িতে ঐ বদনাম, তোমাদের কাছে এলে…"

রবিবার, তাহার উপর অনেকদিন পরে দেখা, সেই সব পুরানো কথা লইয়া দুই বন্ধুতে কিছুক্ষণ হাস্য-রহস্যালাপ চলিল, গড়গড়ার নলটা হাত-ফের হইতে লাগিল। শেষবার নলটা বাড়াইয়া ধরিয়া আশুতোষ বলিলেন—"হ্যাঁ, এই দেখো, যার জন্যে আসা সে-কথাটা একেবারেই ভুলে গেছলাম—তবু তোমরা বদনাম দিতে ছাড়বে না; ইয়ে—কাল সকালে ঐখানেই খাবে।"

বেশ একটু অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তবুও দীননাথের মুখের ভাবটা বন্ধুর দৃষ্টি এড়াইল না, বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"ওকি দীনো, খাবার নামে হঠাৎ ওরকম হয়ে গেলে যে!"

দীননাথ ততক্ষণে একটা ছুতা ঠিক করিয়া লইয়াছেন, হাসিবার

চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"না, খেতে হবে সেতো তোফা খবর হে—তোমাদের দীনো তেমনই ভোজনবিলাস আছে, বয়স হলে কি হয়; কিন্তু কথা হচ্ছে যাবো কখন?—দশটা তেরোয় গাড়ি—তার মানে…"

আশুতোষ বাধা দিয়া বলিলেন—"তোমায় আমি ঠিক সময়েই খাইয়ে দোব, তারপর আমাদের স্টেশনেই উঠে পোড়ো, কাছেও হবে, পনেরো মিনিট বেশি সময়ও পাবে। না ভাই, যেতেই হবে; ছেলেটার অন্নপ্রাশন—বুড়ো-বয়সের ছেলে—আর কত ভেঙে বলব তোমায়? …যাবে; না গেলে ভয়ানক দুঃখ হবে আমার ভাই…"

দীননাথ ততক্ষণে আরও সামলাইয়া লইয়াছেন, হাসিয়া বলিলেন—"যাবো হে, যাবো, তুমি অত করে বলছ কেন? আমার নিজের টান নেই?—চেকরে মানুষ, তাই একটু ভাবিয়ে তুলেছিল; আর ছেলের ভাত, একথা বলও নি তো আগে। মোদ্দা যতো শীগগির ছেড়ে দিতে পার আমায়।"

"আটটার সময় গেলেও তোয়ের পাবে, সাড়ে আটটায় আমাদের ছুলুর গাড়ি যে। মোদ্দা দেখো—হ্যাঁ!"

২

আশুতোষ চলিয়া গেলে দীননাথ মনের আক্রোশ মিটাইয়া খুব একচোট বকিয়া গেলেন—কখন বা মনে-মনেই, কখন একটু স্পষ্টভাবে; নাও, নেমতন্ন করে গেলেন!…তোমার আর কি বাবা,—বাপ নগদ টাকা রেখে গেছে, পায়ের ওপর পা দিয়ে খাচ্ছ, কত ধানে কত চাল একটু খতিয়ে দেখবার তো দরকার হয় না। সখের প্রাণ, বুড়ো বয়সে বিয়ে

করলে, গিন্নিও বছর না ঘুরতে একটি করে সাপ্লাই করে যাচ্ছেন—ফূর্তি করে অন্নপ্রাশন দিয়ে যাচ্ছ।...তা দে না বাপু,টাকা আছে, আরও কষে বিয়ে কর, মাসে একটা করে অন্নপ্রাশন লেগে থাক বাড়িতে, কিন্তু আমাদের এর মধ্যে টেনে আতান্তরে ফেলিস কেন?...এখন কি করি বলো তো?—বাবু তো লম্বা লম্বা পা ফেলে এসে ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন করে গেলেন।...না বাবা, এ খেটে খেতে হচ্ছে, আছি ভালো, পরের সুবিধে-অসুবিধে যে কোথায়—দুনিয়া যে কি চালে কখন্ চলছে, অন্তত সে খোঁজটুকু রাখি। ওঁর আর কি?—পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খাচ্ছেন আর নেমন্তন্ন করে বেড়াচ্ছেন।

খানিকটা বকিয়া গিয়া মনটা একটু হালকা হইল, তাহার পর নীরবে খানিকক্ষণ একটানা গড়গড়া টানিয়া একটু নরমও হইল, শান্তভাবে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—করেই বা কি? আর অন্যায়টাই বা কি করেছে যে এত করে বলছি?...আহা বেচারা আশু!—কোন কাজটিতে কখনও বাদ দেয় না! আর কেউ হোক না হোক, দীনোর আসা চাই-ই।. ছেলেবেলার বন্ধু বলে কেই-বা এমন করে মনে করে রাখে বলো?—আশুর মতন যাদের টাকা তাদের তো আরও মনে থাকে না। সব বুঝি, কিন্তু তবুও বলি—ফ্যাসাদে ফেললে হে ভাই আশু...

আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিলেন, তাহার পর আবার স্বগতোক্তি আরম্ভ হইল,—না হয় কাটিয়েই দোব? তাও তো হয়—শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল—কিংবা ধরো বড়বাবু হঠাৎ একটা লোক পাঠিয়েছিল, ভোরের ট্রেনেই বেরিয়ে যেতে হোল—এমন হয়েছেও তো দু'একবার, আশু জানে; কিংবা গিন্নির বুক-ধড়ফড়ানি ডাক্তার ডাকবার মতন অবস্থা—তাও আশুর জানা; কিংবা—

একটু চেষ্টা করিতে একরাশ এই রকম ওজুহাত হাতের কাছে আসিয়া পড়িল। —ম্যাক আর্থার ইণ্ডিয়া লিমিটেডের একটি সেকশনের চার্জে দীননাথ—কুড়ি টাকায় অনরস্ত করিয়া আজ মাস গেলে দুশোটি টাকা ঘরে আনিতেছেন, মাথার অভাব নাই তো; কিন্তু ওজুহাতগুলি সবই বড় হালকা ঠেকিল। এরকম হালকা একটা ছুতা করার আর একটা বিপদ এই যে, বন্ধু মনে করিবে, ঐ যে নিমন্ত্রণে গিয়া দুটো টাকা মুখ-দেখানি দিতে হইবে, দীননাথ সেইটা ফাঁকি দিবার মতলব অাঁটিয়াছে; বিপদ কি একরকম? …তাও যদি ছেলেপুলে কেহ একজন বাড়িতে থাকিত তাহাদের হাতে টাকা দুটো পাঠাইয়া স্বচ্ছন্দেই একটা ছুতা করিয়া বসিয়া থাকা যাইত—কপাল দোষে ছোটটি মামার বাড়ি গিয়া বসিয়া আছে, বড়—হাবুলটি…

এইখানে আসিয়া দীননাথের চিন্তাস্রোত এক জায়গায় দাঁড়াইয়া ঘুরপাক খাইতে লাগিল। হাবুল কাল শ্বশুরবাড়ি গেল; সকাল থেকেই গোছগাছের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল, অফিস যাওয়ার ব্যস্ততার মধ্যেই দীননাথ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করিতেছিলেন—গ্লেজকিডের নিউকাট জুতাটি প্রাণের সব দরদ দিয়া ডুলিয়া ডুলিয়া পালিশ করিতেছে; একবার সাইকেলে বোঁ করিয়া ধোবার-বাড়ি হইতে একটা হাতকাটা গেঞ্জি, গোটা দুই গিলা-করা পাঞ্জাবী আর তিনখানি ধুতি লইয়া আসিল, অফিসে বাহির হইয়া যাইবার সময় চোখে পড়িল—পড়িবার ঘরে চৌকির উপর বসিয়া বিপুল উৎসাহে নাক মুখ খিঁচাইয়া কোঁচার ভাঁজ পালিশ করিতেছে…। একটা দিনও যদি হতভাগা দেরি করিয়া যায় তো এতটা দুর্ভাবনায় আর পড়িতে হয় না।

হাবুলের জামাই-বেশ থেকে দীননাথের হঠাৎ নিজের জামাইয়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। দেখিতে দেখিতে চোখ দুইটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটিল—এত ঘন ঘন তামাক টানিতে লাগিলেন যে, যেটুকু-বা অবশিষ্ট ছিল পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল ; দীননাথ কন্যাকে ডাকিলেন—"চিনুর মা, শীগগির ছিলিমটা আর একবার সেজে নিয়ে আয় তো ; শীগগির…"

কুড়ি টাকাকে দু'শ টাকায় পরিণত করিতে এই মন্ত্রীই মাথায় বুদ্ধির কুণ্ডলী পাকাইয়া—বহুৎ সাহায্য করিয়াছে, যতক্ষণ না আসিল দীননাথ ব্যস্তভাবে রকটাতে পায়চারি করিতে লাগিলেন। জামাই গোবিন্দের ছবিটি চোখের সামনে জ্বল জ্বল করিতেছে—জোড়ে গাড়ি হইতে নামিল, কি ফিটফাট! ঢিলা মালকোঁচা করিয়া কাপড় পরা, সেলুনে চুল ছাঁটা, গায়ে পাশ-বোতাম পাঞ্জাবী, হাতে একটা সুটকেশ। ওঁদের যুগে জামাই হাতে একটা কুটা তুলিতেও লজ্জা পাইত, আজকাল জামাইয়ের একটা সুটকেশ থাকিবেই—তাহাতে তাহার কাপড়চোপড়, তোয়ালে, আর্শি-চিরুণি, টুথ-ব্রাস। ইহারা যে আত্মসম্পূর্ণ, সদা-প্রস্তুত, স্মার্ট, এ যুগটাই যে আলাদা। তামাক আসিয়া গড়গড়ার মাথায় নিজের জায়গাটিতে গুছাইয়া বসিলে, তিনিও নিজের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া গভীর মন্ত্রণা চলিল, দীননাথের চোখ মুখ ক্রমেই অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। শেষে একসময় চেয়ারের হাতলে একটা চড় মারিয়া বলিলেন—"যাবো, যায়েঙ্গা!… তোমার ছেলের অন্নপ্রাশন আশু, আর আমি যাবো না—একি একটা কথা! ষষ্ঠী পুজো মাকাল পুজো বাদ দিই নি, আর এ একেবারে ছেলের অন্নপ্রাশন—কী যে বলে সব!…"

হাঁকিলেন—"চিনু, তোর মাকে একবার ডেকে দে তো মা!"

স্ত্রী আসিলে বলিলেন—"হ্যাঁগা, জামাই সেই জোড়ে একবার এসেছিল তারপর কতদিন আসে নি?"

স্ত্রী একটু বিস্মিত ভাবেই বলিলেন—"কতদিন কি গো! বিয়েই তো হয়েছে সবে এই দিন কুড়ি হোল, আট দিন পরে জোড়ে এসেছিল, তিনদিন ছিল; হিসেব করে দেখো না কতদিন আসে নি তাহলে।... তা হঠাৎ জামাই আসার কথা?"

"নতুন জামাই, কোশখানেকের মধ্যে বাড়ি, জোড়ের পর এতদিন আনা হয় নি, তোমার কম মনে হোল? আর এই আসাই তো হবে আসল শ্বশুরবাড়ি আসা, জোড়ের আসা সে তো একটা পদ্ধতি—তা ধরতে গেলে তো বিয়ে করতে আসাও ধরে বলতে হয় জামাই দু'বার এসে গেছে।"

হঠাৎ এই অসময়ে জামাইযের প্রতি এত দরদে স্ত্রী আরও বিস্মিত হইয়া গেছেন, বলিলেন—"তা ডাকিয়ে আনাও না বাপু, আমি কি মানা করছি, না, আমার অসাধ? এতদিন বলোও নি তো।"

"নাও, উল্টো চাপ! তুমি বাড়ির গিন্নি, আমায় মনে করিয়ে দিতে হবে? আমি হলাম ডেলি প্যাসেঞ্জার; বলে হাজারটা রাস্তার কুকুর মরে একটা ডেলি প্যাসেঞ্জার হয়—আমার সঙ্গে বাড়ির কতটুকুই বা সম্বন্ধ? খোকাটার কথা ফুটলে তোমাকেই কোন রববারে বলবে—বাগানের মুনিষ নাইবার জন্যে তেল চাইছে।"

"বেশ আমারই দোষ, তকে তো এঁটে উঠতে পারব না, মেনে নিচ্ছি; তা কি কর্তে হবে?"

"হঠাৎ তামাক খেতে খেতে মনে পড়ল কথাটা ডেকে বলে দিলাম,

যা ঠিক হয় তাই করো।"

"এটা যেন রাগের কথা হোল।...বেশ হাবুল আসুক ফিরে, বলে পাঠাচ্ছি।"

"এর সঙ্গে হাবুলের কি সম্বন্ধ আমার তো বুদ্ধিতে আসছে না; হাবুল তার নিজের শ্বশুর বাড়ি গেছে, তোমার জামাই তার নিজের শ্বশুর বাড়ি আসবে..."

"হাবুলের মনে কষ্ট হবে না? জোড়ের পর ভগ্নীপতি প্রথমবার শ্বশুর বাড়ি এল..."

"সেটা তার পক্ষে কষ্টের কথা?"

"কি জ্বালা! —সে যে থাকছে না গো। কথা শেষ করতে দেবে না, তক্ক!"

"মেয়েদের কথা শেষ করতে দিলে কাজ আরম্ভ করবার সময়ই পাওয়া যেত না দুনিয়ায়—বাক্‌সর্বস্বই তো তোমরা?...হাবুল কাল গেছে; কাল, না হয় পরশু আসবেই; তোমার জামাই যদি কাল সকালে আসে অন্তত দিন তিনেক তো থাকবেই—হাবুলের সঙ্গে দেখা হয় কিনা হিসেব করে দেখো না—"

"কাল সকালেই?"

"হাবুলেরও পাঁচদিন ছুটি, গোবিন্দও পাঁচদিন ছুটি; হিসেব না করে বলিনি; ওর কলেজ, এর না হয় কাছারি।"

"তাহলে তো দেখছি এক্ষুণি বলে পাঠাতে হয়। আর সত্যিই তো, কাল সকালে যদি আসেন জামাই, তাহলেও কোন রকমে তিনটে দিন পুরো হয়। কি করি তা'হলে?"

"কোন্ ন'শো পঞ্চাশ কোশ দূর? —একটা চিঠি লিখে দাও

বেহানকে, হারাধনকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। ...একটু বিবিয্যিটিবি্য দিয়ে, কাকুতি-মিনতি করে লিখো যেমন লেখা উচিত, আর লিখবে, আমি সকাল আটটার সময় বেরিয়ে যাব, খুব ইচ্ছে বাবাজীকে একবার দেখে যাই, কাল নাও ফিরতে পারি। ওটুকু না জুড়ে দিলে খাইয়ে-দাইয়ে দুপুরের পর পাঠাবে। আর...”

একটি বিশেষ ধরণে স্ত্রীর পানে চাহিয়া খুব সূক্ষ্মভাবে একটু হাসিলেন। স্ত্রীও ততটুকুই হাসিয়া বলিলেন—“আর বলতে হবে না, বুঝেছি।”

—বুঝিবার কথাটা এই যে, কন্যাও যেন লুকাইয়া জামাইয়ের জন্য একখানা চিঠি হারাধনের হাতে দিবার সুযোগ পায়; তাহা হইলে ব্যবস্থাটা একটু পাকা হয় আর কি।

৩

কাহার চিঠিতে বেশি কাজ হইল বলা যায় না, তবে পরদিন সকাল আটটার সময় জামাই গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। বেগুনে লুঙ্গিটি পরিয়া মুখে যথাসম্ভব নিশ্চিন্তভাব ফুটাইয়া খুব চিন্তিতভাবে দীননাথ রকে বসিয়া তামাক সেবন করিতেছিলেন এবং আড়চোখে ঘন ঘন ঘরের ভিতরকার ঘড়িটার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন; গোবিন্দ সুটকেস হাতে গাড়ি হইতে নামিয়া যখন প্রণাম করিল, তখন দেখিলেন ঠিক কাঁটায় কাঁটায় আটটা। আশীর্বাদ করিয়া ধীরে ধীরে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস মোচন করিলেন।

গোবিন্দ ভিতরে চলিয়া গেলে দীননাথ হিসাবটা করিয়া লইলেন। এখন আটটা, গাড়ি দশটা তেরোয়, তাহা হইলে দু ঘণ্টা তেরো মিনিট সময়। ও তেরোটা মিনিট হাতে রাখিয়া দু ঘণ্টা ধরাই ভালো। আশুর বাড়ি যাইতে দশ মিনিট, আসিতে কুড়ি মিনিট—আহার সম্বন্ধে এখনও দীননাথের একটু দুর্বলতা আছে, না-না করিয়াও একটু চাপ হইয়া যায়ই ; এই গেল আধ ঘণ্টা। আহারে আধ ঘণ্টা, এই পুরো এক ঘণ্টা। তাহার মানে যদি ঠিক সাড়ে আটটার সময় বাহির হইতে পারা যায় তো সাড়ে নটায় ফিরিয়া আসা চলে। ওদিকের স্টেশন দিয়া যাওয়া চলে না, তাহার মানে তো পেণ্টলুন পরিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাওয়া, তাহা হইলে কিই-বা দরকার ছিল এত কাঠ-খড় পোড়াইয়া গোবিন্দকে ডাকিয়া আনার? তাহা হইলে আসিয়া তাড়াতাড়ি অফিসের পোষাক পরিয়া একটু জিরাইয়া লইয়া স্টেশনে পৌঁছিতে আধ ঘণ্টা হাতে থাকিবে ; যথেষ্ট, ঐ তেরোটা মিনিট তো রহিল…।

মিনিট দশেক অপেক্ষা করিতে হইল। তাহার পর দীননাথ ভিতরে গেলেন। গোবিন্দ জামা-জুতা পরিয়াই ভিতরের রকে একটা আসনে বসিয়া শাশুড়ির সহিত গল্প করিতেছিল, দীননাথ ঢুকিয়াই একটু হাসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন—"যা ভেবেছি ; গল্প পরে হবে'খন, এখন ওকে ছেড়ে দাও, জামা-জুতো ছাড়ুক ; যাও বাবাজী, ওঠ…নিয়ে যা ঘরে চিনু।"

ছোট শালি চিনু সঙ্গে করিয়া পাশের ঘরে লইয়া গেলে একটু চাপা গলায় অথচ যাহাতে গোবিন্দ শুনিতেও পায়, এইভাবে স্ত্রীকে যেন সতর্ক করিয়া দিবার ভঙ্গিতে বলিলেন—"ওদের একেবারে ঘড়ি

ধরে কাজ করা অভ্যেস, ছেলে-বুড়ো, মেয়ে-মদ্দ—সবার ; কেন, তোমায় তো বলেছিলাম এর আগে।"

হঠাৎ এই তাড়াহুড়ার ভাবে স্ত্রী একটু বিমূঢ়ই হইয়া গিয়াছিলেন ; কিছু না বলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

দীননাথ বলিলেন—"ঠিক ঘড়ি ধরে সাড়ে আটটার সময় স্নান করতে যাবে, তারপর পূজো—সাড়ে নটা পর্যন্ত, তারপর···"

গৃহিণী যেন চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"পূজো কি গো !"

বেশ চাপা গলায় বলিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বিস্ময়ের আধিক্যে কথাটা গোবিন্দের কানে পৌঁছিয়া গেল। শ্বশুরের কথাগুলাও পৌঁছিয়াছে, সে একটু অন্যমনস্কভাবেই শালির সঙ্গে গল্প করিতে করিতে জুতার ফিতা খুলিতেছিল, আরও সতর্ক হইয়া কান খাড়া করিল।

শ্বশুর বলিতেছেন—চাপা গলাতেই—"'পূজো কি গো' মানে ?··· বাইরে বাইরে অমন ব'লে ? ভয়ানক সাত্ত্বিক বংশ যে, সন্ধ্যে-আহ্নিক পূজো না করে জল খায় না। দেখতে পেলে না মুখটা শুকন ? গোবিন্দর আবার বেশি বেশি যে, প্রায় ঘণ্টা খানেকের কাছাকাছি···"

গোবিন্দর মুখটা শুকাইয়া গেল, শালিটি ছোট, বছর আষ্টেকের, খুব উৎসাহের সঙ্গে নূতন জামাইবাবুর সঙ্গে গল্প করিতেছিল, গোবিন্দ হাত উঁচাইয়া তাহাকে থামিতে ইসারা করিল।

শাশুড়ি আরও চাপা গলায় প্রশ্ন করিলেন—"সত্যি ?" বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না।

শ্বশুর ওঘরে কথাবার্তা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় গলাটা আর একটু

চাপিয়া দিলেন—"গরদ পরে—সুতী কাপড় পরবে না…ভয়ানক সাত্ত্বিক বংশ যে!…"

তাহার পর বাহিরে যাওয়ার শব্দ হইল।

গোবিন্দর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। যথা-পদ্ধতি চা টোস্ট ডিম সাঁটাইয়া বাহির হইয়াছে, শাশুড়ি নিশ্চয় এইবার লক্ষ্য করিবেন, মুখ শুকন না দেখিয়া কি মনে করিবেন ভাবিয়া মুখ শুকাইয়া গেল। তারপর পূজার যে 'প' পর্যন্ত জানে না সে, কোন মুখে বসিতে হয় তাহা পর্যন্ত নয়—গরদ পরিয়া একঘণ্টা বসিয়া বসিয়া কি করিবে? গতবার জোড়ে যখন আসিয়াছিল, এ বিপদের তো সম্মুখীন হইতে হয় নাই। আর শ্বশুর এ-সব তত্ত্ব কি করিয়া সংগ্রহ করিলেন?—কে এইসব মিথ্যা সংবাদ দিয়া গোবিন্দর সঙ্গে শত্রুতা করিল? উপায় এখন?

শালি ঠাট্টা করিয়া বলিল—"জামাইবাবুর জুতোর ফিতে আজ খুলবে না?"

গোবিন্দর সম্বিৎ হইল—"অ্যাঁ?…এই যে"—বলিয়া তাড়াতাড়ি জুতা জোড়া খুলিয়া জামা খুলিল, তাহার পর হাতের ঘড়িটা দেখিয়া বলিল…"ওঃ, দেরি হয়ে গেল তো!"

শাশুড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—একটু অপ্রতিভ ভাব—এমন জামাইকে অতদিন অমন ভাবিয়াছিলেন! সামনে আসিতেই কুণ্ঠা বোধ হইতেছে। দোরের পর্দার পাশে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"উনি এইমাত্র বলছিলেন—তোমাদের বাড়িতে সব ঘড়ি ধরে কাজ; আমি কি জানি বাবা?…তা বাথরুমে সব তোয়ের আছে—জলও তোলা আছে, আর নেয়ে উঠে নাকি পূজা-আহ্নিক?…"

গোবিন্দ অত্যন্ত লজ্জিতভাবে মুখ নিচু করিয়া একটু হাসিল।

শাশুড়ি স্বামীর কথার প্রমাণ পাইয়া আরও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন —"দেখো বাবা! কেউ বলে তবে তো…উনি বলছিলেন সুতীর কাপড় পর্যন্ত পূজোর সময় পর না, আর জোড়ে এসে এসব কিছুই বন্দবস্ত করা হয়নি গা!…বেয়ান শুনলে কি ভাববেন!…"

গোবিন্দ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"না, তার জন্যে কি হয়েছে?… ভেবেছিলাম এখানে ব্যবস্থা নেই; বললেই আপনারা বিব্রত হয়ে পড়বেন, তাই বলি নি।"

"ওমা, ব্যবস্থা নেই কি বাবা। তোমার শ্বশুরেরই এ পাট নেই, তা' বলে হিঁদুর বাড়িতে পূজোর ব্যবস্থা থাকবে না। চিল কোটার পাশে দস্তুর মতো পূজোর ঘর রয়েছে, সেকি কথা!…নাও, আর দেরি করো না, সাড়ে আটটা বাজতে আর কত দেরি বাবা?"

পূজোর ঘরটা নিরিবিলিতে একেবার চিল কোটার পাশে শুনিয়া গোবিন্দর খানিকটা উৎসাহ আসিয়াছে, হাত উল্টাইয়া ঘড়ি দেখিয়া বলিল—"এখনও মিনিট দশেক সময় আছে। আর পাঁচ দশ মিনিট এদিক ওদিক হলে আর ক্ষতি কি মা?—ছুটির দিন—আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

দীননাথ আসিয়া দাঁড়াইলেন, গৃহিণীকে বলিলেন—"কাপড়-গামছা বের করে…"

গোবিন্দ বলিল—"আজ্ঞে, সব রয়েছে!" বলিয়া পাছে কাপড় গামছা দেওয়া হয় সেইজন্য তাড়াতাড়ি সুটকেশ খুলিয়া ধুতি তোয়ালে বাহির করিয়া ফেলিল। আজকালকার ছেলে খুব স্মার্ট যে এসব বিষয়ে।

শ্বশুর গৃহিণীকে বলিলেন—"ওকে ততক্ষণ একটা গরদ বের করে দাও।"

হাসিয়া বলিলেন—"ভট্টচার্যির বেটার আমার আবার এক ঘণ্টা ধরে পুজোর হিড়িক আছে যে!...ঐ যে এ সেদিন আমায় বললে—কি যে ভালো নামটি ভুলে যাচ্ছি।...এযুগে আর এসব কেন বাবা?"

গৃহিণী ধমক দিয়া বলিলেন—"না, সবাই তোমার মতন হবে! বুড়ো আঙুলে একবার পৈতে জড়াতেও কখনও দেখলাম না..."

স্বামী হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন—"তুমি গরদটা বের করে দাওগে। ...চিনু গোবিন্দর কাপড়টা ততক্ষণ কুঁচিয়ে রাখ্...পারবি নি?—না হয় আয় বাইরের ঘরে কি রকম করে কাপড় কুঁচুতে হয় শিখিয়ে দিই...তুমি যাও গো, বাবাজি যাও...না, ভালো ভালো, ঠাট্টা করছি বলে কি আর সত্যিই বলছি?...বাচস্পতির বংশ তোমাদের..."

ম্যাক আর্থার কোম্পানির একটা সেকশনের ইন্-চার্জ—টাকা আছে, কড়ি আছে, বাড়ি আছে, বিষয় আছে, প্রতিপত্তি আছে; নিদারুণ কন্ট্রোলের বাজারে নাই শুধু কাপড়, একটি যাহা ছিল, ছেলে লইয়া শ্বশুরবাড়ি গেছে, তাহাকেও সেখানে স্মার্ট হইতে হইবে তো? সেও তো জানে শ্বশুরের কাছে কাপড়ের ভরসা করিয়া শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার যুগ আর নাই। দীননাথ বাহিরের ঘরে গিয়া একটা ছুতা করিয়া চিনুকে সরাইয়া দিলেন; বড় মেয়ে আর স্ত্রী ওদিকে নবাগতের আয়োজনে ব্যস্ত। ...জামাই যখন বাথরুমে ঢুকিয়া

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, শ্বশুর তখন তাহার কাপড়টি তাড়াতাড়ি কোঁচাইয়া পরিধান করিতেছেন।

মোটে একঘণ্টা সময়, তাহার মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া খুব সন্তর্পণে যথাপূর্ব লুঙ্গিটা পরিয়া কাপড়খানি কোঁচাইয়া আলনায় টাঙাইয়া বলিতে হইবে—"কেরে চিনু, গোবিন্দ এখনও নামে নি নাকি ওপর থেকে ?"

চিনু বলিবে—"না তো বাবা।"

দীননাথ বলিবেন—"হুঁ", তাইতো দেখছি. কাপড়টা এখনও নিয়েও যাস্‌নি।"

চিনু বলিবে—"তুমি যে দোরে তালা দিয়ে নেমতন্ন খেতে চলে গিয়েছিলে বাবা।"

দীননাথ বলিবেন—"হ্যাঁ, তাও তো বটে ; যা তাড়াহুড়োর মধ্যে যাওয়া, খেয়ালই ছিল না। তা নিয়ে গিয়ে ঐ ঘরেই রেখে দে, নয় তো আবার ঐরকম ভুল হলেই চিত্তির !..."



মুনাফা

রাত প্রায় একটায় মোকামাঘাটে আসিয়া নামিলাম।

স্টেশনটা গঙ্গার ধারেই; টানা একটা বারান্দা, তাহার পরেই তীরভূমি ঢালু হইয়া নামিয়া গেছে। নূতন বর্ষার গঙ্গা অনেকখানি উঠিয়া আসিয়াছে, ওয়েটিংরুম হইতে কাকজ্যোৎস্নায় গৈরিকধারার বহুদূর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

ছোট ঘরটি লোকে একরকম ঠাসা, কি উপায় করিব ভাবিতেছি এমন সময় আপ্ ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল এবং গাড়ি আসিয়া পৌঁছিবার আগেই ঘরটি একেবারে খালি হইয়া গেল। রহিল মাত্র এক মাড়োয়ারী শেঠজি। খুব চাপাচাপির মধ্যে ছিল, ভিড় হালকা হওয়ায় মনের স্ফূর্তিতে একটু অভ্যর্থনাই করিয়া লইল আমায়—"আসেন বাঙ্গালীবাবু, ই জগহ্‌টা বেশ হাওয়াদার আছে।...উ সবাই বক্‌তিয়ারপুরের বোরযাত্রী ছিল; সব গঙ্গামাইকি কৃপা।"

দরজাটির মুখে বিছানা করিয়া শুইয়াছিল, আমিও পাশটিতে গিয়া আমার হোল্ড-অল খুলিয়া বিছানাটা পাতিয়া লইলাম। ভদ্রলোক একটু আলাপপ্রবণ, বিছানাটা আর একটু সরাইয়া আনিয়া কথাবার্তা জমাইয়া আনিয়াছে, এমন সময় এই আপ ট্রেনের একজন যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বেশ অবস্থাপন্ন লোক বলিয়া মনে হইল : আয়েসপুষ্ট বিরাট বপু, ফিনফিনে একটি গলারপাশে-ঘুন্টি-দেওয়া পাঞ্জাবী, তাহার ভিতরে একছড়া শক্ত সোনার চেন চিক চিক করিতেছে, হাতে রিস্ট-ব্যাণ্ড-দেওয়া শৌখিন ঘড়ি, রূপায় বাঁধানো একটি শৌখিন ছড়ি; এদিকে হোল্ড-অল, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, জলপানের জন্য একটি রূপার ঝারি, শরীরের অনুপাতে একটি মোরাদাবাদী ধাতুর টিফিন কেরিয়ার,—মোট কথা চমৎকার একট সচ্ছলতার আবহাওয়া লইয়া প্রবেশ করিলেন ভদ্রলোক। নিশ্চয় রিজার্ভ-করা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থে আরামে ঘুমাইতেছিলেন, চোখে ঘুমের জড়িমা লাগিয়া আছে।

সঙ্গে একটি চাকর। বেশ তৎপর। প্রথমেই আসিয়া ওয়েটিংরুমের আরাম কেদারাটা গঙ্গার দিকের বারান্দায় বাহির করিয়া দিল, ভদ্রলোক গিয়া তাহাতে গা এলাইয়া দিলেন, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নাসিকার্জ্জন আরম্ভ হইয়া গেল। চাকরটা আসিয়া মোটঘাট-গুলা অল্পসময়ের মধ্যেই গুছাইয়া হোল্ড-অল খুলিয়া বিছানাটা পাতিয়া ফেলিল, দোরের আংটায়, জানালার গরাদে, দেয়ালে-গাঁথা আলনায় দড়ি বাঁধিয়া একটি পরিষ্কার নেটের মশারি খাটাইয়া দিল, তাহার পর বাহিরে গিয়া বার দুই তিন গলাখাঁকারি দিয়া খবর দিল—"তৈয়ার বা।"

ভদ্রলোক উঠিয়া আসিয়া শয্যায় মধ্যে প্রবেশ করিলেন, চাকরটা

বেশ ভালো করিয়া মশারিটা চারিদিকে গুঁজিয়া দিল ; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার নাসিকাধ্বনি আরম্ভ হইয়া গেল।

সব লইয়া মিনিট পাঁচেকও লাগিল না ; যেন আলাদিনের প্রদীপের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ হইয়া গেল।

এদিকে শেষ হইলে চাকরটা জিনিসপত্রগুলার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া লইয়া আমাদের দুইজনের দিকে মিনতির দৃষ্টিতে চাহিয়া সেগুলার উপর একটু নজর রাখিতে অনুরোধ করিল।

শেঠজি উৎসাহের সঙ্গে বলিল—"যাও, তুম্ বেফিকির শো রহো, কোই ডর্ নেহি।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলাম—কেন, সে তো নিজেও শুইয়া থাকিতে পারে—এত দামী জিনিসপত্র রহিয়াছে ঘরের মধ্যে। উত্তরটা শেঠজিই দিল, আমার অজ্ঞতায় জিভটা কাটিয়া চোক দুইটা একটু বড় বড় করিয়া বলিল—"আরে রাম কহিয়ে বাবুজি, চাকর আর মনিব একটি ঘরে শোবে!—হাজার কল্-যুগ হোক।"

চাকরটাকে বলিলেন—"যাও তুম্, কোই ডর নেহি।"

সে চলিয়া গেলে শেঠজি নিদ্রিতের পানে একদৃষ্টে খানিক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল—"আরাম বোলবেন তো এইকে বলুন বাঙ্গালীবাবু, জিন্দগিকে কেমোন ভোগ করছে, ট্রেনে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে যত্তো আরামের ব্যবোস্থা। আর আমাদের কাঁহা দু পয়সা মুনাফা, ছোট্ লোটা কম্বল নিয়ে—না খাবার ঠিকানা, না শোবার ঠিকানা।"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম—"মুনাফার পেছনে ছোটাটাই তো আদৎ জিন্দগী শেঠজি, ঘুমিয়ে কাটানো—সে তো তার উল্ট বরং।"

কথাটা মনের মতন হওয়ায় শেঠজির মুখে হাসি ফুটিল, মনটা দ্রব হইল, এবং সেই তরলতার জন্যই বোধ হয় হঠাৎ ধর্মভাব আসিয়া পড়িল, একটু করুণ সুরে বলিল—"লেকিন, কী হোবে বাবু মুনাফা হাঁসিল করে ?—সঙ্গে লিয়ে যেতে পারব ওখানে ?"

—আকাশের পানে হাত বাড়াইয়া দেখাইল।

বলিলাম—"কি জানেন শেঠজি, এইটে হচ্ছে গুরু, এই মুনাফার হিসাব করতে করতেই ওখানে নিয়ে যাবার যুগ্যি মুনাফার হিসেব আসে ; ঠিক নয় কি ?"

শেঠজি একেবারে বিগলিত হইয়া গেল, বলিল—"যা বোলছেন বাঙ্গালীবাবু তাতে কোন ভুল না আছে, লেকিন ঐখানের কথা আমাদের সব সময় অস্মরণ থাকে না, দুনিয়ার মুনাফা নিয়ে মশগুল হয়ে থাকি আমরা। তুলসীদাস কি বলছেন..."

তুলসীদাসের পরে আসিলেন কবীর, কবীরের পর সুরদাস, শেঠজি দোহাচৌপাইয়ের অনর্গল স্রোত বহাইয়া চলিল।

এদিকে অসম্ভব রকম মশা, অতগুলা মানুষের জায়গায় কুলো-দুইজন, হন্যে হইয়া আক্রমণ লাগাইয়াছে, শেঠজির দিকে কান রাখিয়া তাহাদের তাড়া দিতে দিতে কখন্ ক্লান্তিবশেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, একটা শান্টিং ইঞ্জিনের হুইশিলে হঠাৎ ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। রাত্রি খুব গভীর, গাড়ি স্টিমার কিছু নাই, স্টেশনের এদিকটা

একেবারে নিস্তব্ধ, শুধু সেই ভদ্রলোকের তৃপ্ত নাসিকাগর্জন ; বাহিরের বারান্দা থেকে আর একটি ক্ষীণতর গর্জন দরজার পথে ভাসিয়া আসিতেছে, বোধ হয় তাঁহার চাকরের।

হাওয়াটা নরম হইয়া গিয়া মশার উপদ্রব আরও বাড়িয়াছে, আত্মরক্ষার জন্য একটা পাৎলা উড়ানি ঢাকা দিয়া শুইয়াছিলাম, আরও একটু যুৎ করিয়া টানিয়া লইব এমন সময় হঠাৎ পাশের দিকে দৃষ্টি পড়ায় একেবারে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া গেলাম।

আগেই বলিয়াছি আমার পাশেই শেঠজির বিছানা, দরজা-পথে হাওয়াটুকুর জন্য চাকরটা তাহার মনিবের বিছানাটি শেঠজির পাশেই করিয়া দিয়াছে, অপেক্ষাকৃত একটু বেশি ব্যবধান ছাড়িয়া।...শেঠজি কনুইয়ে ভর দিয়া আধ-শোওয়া হইয়া ওদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিয়াছে, এবং সবচেয়ে যা বড় আশ্চর্য, ভদ্রলোকের মশারির খানিকটা তুলিয়া ধরিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত ভিতরে কি নিরীক্ষণ করিতেছে। ...ঘুমের ঘোরে এমন অদ্ভুত দৃশ্যে আমার তো মাথা গুলাইয়া গেল, ব্যাপারখানা কি ?—ছিঁচকে চোর নাকি ? সন্দেহ যখন মনে প্রবেশ করিল, ওর কথাবার্তা চালচলন সব কিছুই সেটাকে পুষ্ট করিয়া তুলিল—আমার কাছে বিছানাটা টানিয়া আনা, চাকরটাকে অত ভরসা দিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া, তারপর এই ধর্ম লইয়া বিটলেমি।—প্রথমটা মনে হইল হাতটা চাপিয়া ভদ্রলোককে ডাকিয়া তুলি। তাহার পর ঠিক করিলাম, না, আর একটু দেখাই যাক, যদি যাহা ভাবিয়াছি তাহাই হয় তো একেবারে বামাল-সুদ্ধ ধরা যাইবে। চাদরটা আস্তে আস্তে মাথা পর্যন্ত টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলাম।

অদ্ভুত কাণ্ড! শেঠজি মশারিটা নামাইয়া দিয়া খুব সন্তর্পণে উঠিয়া

এদিকে প্ল্যাটফর্ম্ আর ওদিকে গঙ্গার ধারের বারান্দাটা একবার দেখিয়া আসিল, তাহাও কেমন যেন সন্দেহজনক ভাবে, ঘরের মধ্যে থেকেই গলা বাড়াইয়া। আমার আগাগোড়া ঢাকা, তাহারই উপর হইতে বেশ ভালো করিয়া আমায় দেখিয়া, তাহার পর আবার মশারিটা তুলিয়া ধরিল, এবার একটু বেশি উঁচু করিয়া। অনেকক্ষণ রহিলও একভাবে এবার, ঘুমন্ত লোকটির দিকে এমন ভাবে মাথা অল্প ঝুঁকাইয়া আছে, বেশ বোঝা যায় তীব্র উৎসুক দৃষ্টির একটুও নড়চড় নাই। আমার মাথা গুলাইয়া যাইতেছে; এদিকটা এমন নিস্তব্ধ, মনে একটা ভয়ও ঠেলিয়া উঠিতেছে—খুনটুন করিবে না তো—নাকে ক্লোরোফর্ম্ চাপিয়া ধরিতেও তো পারে—দলবদ্ধ নয় তো?—হয়তো সঙ্গীরা বাহিরে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অপেক্ষা করিতেছে…

আর একবার ঐভাবে উঠিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, আমার সম্বন্ধেও নিশ্চিন্ত হইয়া মশারিটা তুলিয়া ধরিতেই, আমি আর এদিক ওদিক না ভাবিয়া পিছন হইতে দুইটা হাত চাপিয়া ধরিলাম, মুখটা ফিরাইতেই প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারখানা কি! তুমি তখন থেকে ভদ্রলোকের মশারি তুলে কি মতলব হাঁসিল করবার…"

শেঠজি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল, আমি যে ঘাপ্‌টি মারিয়া পড়িয়া সব লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলাম যেন বিশ্বাসই করিতে পারিতেছেনা, তাহার পরে জিভ কাটিয়া, চাপা গলায় বলিল—"আরে ছিঃ, বাঙ্গালীবাবু, রাম বলো, কি বোলছেন আপনি!

আমার মোতিহারীতে তিনটা গোলা, কোলকাত্তায়, কানপুরে মস্তো কারবার—আরে ছিঃ—হাত ছাড়িয়ে দিন বাবুজি..."

হাত ছাড়িলাম না, বলিলাম—"কলকাতা-কানপুর-মোতিহারীর খবর জানবার উপায় নেই—কিন্তু চোখের সামনে তখন থেকে যা দেখছি···চাকরকে সরিয়ে দিলে—তারপর ভদ্রলোকের সোনার চেনের দিকে···"

শেঠজি ঘুরিয়া মুষ্টিবদ্ধ অবস্থাতেই ডান হাতটা আমার মুখের ওপর চাপিয়া ধরিল ; মুখে নিতান্তই একটা ব্যাকুলতার ভাব, বলিল—"আরে ছিঃ বাবুজি, অমন কোথাটি বোলবেন না, গঙ্গাজীর কিনারা আছে। সরিয়ে আসেন, শুনেন, ভোদ্দোরলোক এখুনি জেগে পড়বে, প্রেমসে ঘুমোচ্ছে।"

অস্বীকার করিব না, বলিবার ভাবে আমি আবার একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেছি, হাত দুইটা ছাড়িয়া দিলাম, দুইজনে আসিয়া আমার বিছানায় বসিলাম।

শেঠজি অসীম করুণার দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল—"গঙ্গামাইয়ের কিনারা আছে, একবারটি বাহিরের দিকে নজর দিয়া দেখেন আপনি···"

বলিলাম—"তাই যা কিছুই করুন না এখানে, কোন দোষ লাগবে না?"

"আরে ছি ছি বাবুজি, ওমোন কথা বলবেন না, গঙ্গাজির কিনারা আছে, পুণ্যকা অস্থান, তাই তুছু পয়লোকের জন্য হাঁসিল করে নিচ্ছিলো।"

এত বিমূঢ় হইয়া গেছি যে মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

শেঠজী বলিয়া চলিল, চোখে মুখে সেইরূপ অপরিসীম কারুণ্য—

"দেখুন বাবুজি মচ্ছরদের ওবোস্থা!—আপনারা বাঙ্গালীরা মোশা বোলেন—এক ঘর মানুষের লেহু খাচ্ছিল গঙ্গামাইকি কৃপাসে—বড়কা ভোজ—তারপর হম্ দুজোনটি রয়ে গেল—আহা-হা-হা! জরাসা ভাবুন!—তারপর আপনি ভি চদ্দর ঢাকা দিয়ে দিলেন—একলা আমি রোগা হাড্ডিসার মানুষ—ভাবুন বাবুজি বেচারিদের ওবোস্থাটা! রাজার হাল থেকে কাঙালী বোনে গেল...গঙ্গাজির কিনারা, পুণ্যকা অস্থান একটু প্যুণ্ হাঁসিল করে নিচ্ছিলো মশারিটি তুলে ধরে—উ জমিদারবাবুর ওতো বোড়ো লাস, দুছটাক লেহু এলেই বা কি গেলেই বা কি—থোরা ঠিক হিসাবসে ভাবিয়ে দেখেন বাবুজী; আমি মশারিটি তুলে একটু পয়লোকের মুনাফা হাঁসিল কোরে নিচ্ছিলো, ব্যস্।"



ছোট বৌমা

একটা দরকারি কাজে দোতলায় শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া কনক দেখিল পর্দার পিছনে দুয়ারটা ভেজানো। তবুও করিত প্রবেশ, কাজটা বিশেষ দরকারি, কিন্তু কানে গেল শ্বশুর-শাশুড়িতে কি কথা বার্তা হইতেছে, আওয়াজ শুনিয়া মনে হইল যেন গোপনীয়। একবার ভাবিল নামিয়া যাই—তাহাই তো উচিত, শ্বশুর-শাশুড়ি গুরুজন; তাহার পর দেখিল সে ধরণের কথাবার্তা কিছু নয়, শ্বশুর খুব জোর দিয়া বলিতেছেন—

“ওগো না, সে হতে পারে না, তার সামনে পরীক্ষা, সামান্য একটা অন্নপ্রাশনের ব্যাপারে তাকে আসতে বলা চলে না। সে তো আসবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছেই।”

শাশুড়ির গলাটা আর একটু চাপা, বলিলেন—“তবে ছোট বৌমাকেও না আনালে চলত।”

“ছোট বৌমার তো পরীক্ষা নেই।”

“যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বোল না, খালি বই মুখস্থ করেছ

আর পরীক্ষা দিয়েছ, কিসে কি যে হয় তাতো জান না।"

"খুব জানি, খুব জানি। তুমি যাও এখন, প্রতুলের আসা হবে না।...পরীক্ষার কথা বলছ, যারা দেয় তারা ওর দাম বোঝে; অত কথা কি, বৌমাকেই জিগ্যেস ক'রো, একটা হোক আধখানা হোক পাস দিয়েছেন, পরীক্ষার মর্য্যাদা..."

"তাঁকে জিগ্যেস করতে যাবো—ও বৌমা, ডেকে আনাবো নাকি প্রতুলকে ?...পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে তো এই বুদ্ধি হয়েছে তোমার !"

"জিগ্যেস করবার আবার রকম-ফের আছে, তারও শিক্ষা চাই—শিখেছ তো শুধু যমপুকুর ব্রত আর আড়ি-পাতা..."

কনক জিভ কামড়াইল, এমন কিছু হাতি-ঘোড়া না হোক, তবুও তো মিড্‌ল ইংলিশ পাস সে,—ভালো হইতেছে কি আড়ি-পাতাটা ?

পা কিন্তু উঠিল না, যেন কামড়াইয়া বসিয়া গেছে।

শাশুড়ি বলিলেন—"কি করে জিগ্যেস করতে হয় নাহয় বাৎলেই দাও, পাস-করা বুদ্ধির দৌড়টা দেখি একবার।...মরিঃ !"

"কেন, যখন পাঁচ জনে বসে আছ, খোকার অন্নপ্রাশনের কথাটা তুললে, তার পর প্রতুলের পরীক্ষা, তাকে আসতে লিখতে পারা গেল না, এ কথাটাও একটু দুঃখু করে বললে, তার পর কোন দিকে চাইবার ভাণ করে একবার ছোট বৌমার মুখের ভাবটা দেখে নিলে—এই তো জিগ্যেস করা হয়ে গেল; কথা কয়েই যে জিগ্যেস করতে হবে তার মানেটা কি ?"

"জ্বালিও না বাপু, মুখের ভাব বোঝবার জন্যে অত কাণ্ড করবার তোমাদেরই দরকার হয়, খুব সুক্ষ্ম বুদ্ধি কি না। মুখের ভাবটা যেন এমনই দেখতে পাচ্ছে না লোকে !...বেশ, ধরো তোমার বুদ্ধি খাটাবার

পর যদি দেখা গেল, শুনেই মুখটি এতটুকু হয়ে গেল, তখন?···দেবে তো লিখে আসতে ?"

সুন্দর চালটি চালিয়াছেন শাশুড়ি, কনক মনে মনে পাসের চেয়ে যমপুকুর-ব্রত-করা বুদ্ধিরই প্রশংসা করিল, কি উত্তরটা হয় এবার শুনিবার জন্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিল। শ্বশুর বেশ একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"আমার তো বিশ্বাস—মুখটি এতটুকু হয়ে যাবে বলে যা ভয় করছ তা হবে না, সে রকম অবুঝ মেয়েই নয়; নিজের পুত্রবধূ, চিনি না আর ?"

"ধরো যদি হয় ?"

শ্বশুর আবার চুপ করিয়া গেলেন। শাশুড়ির বুদ্ধিতে কনকের এত আনন্দ হইতেছে! ও যেন দেখিতে পাইতেছে শ্বশুর বোকা বনিয়া শাশুড়ির মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন।···তাহার পর শ্বশুর বলিলেন—"যদি হয়?—যদি হয়?···যদি হয় মনে করো তো তারও উপায় আছে; ও-রকম ভাবে না জিগ্যেস করে বরং বলো—খুব দুঃখু করেই বলো—প্রতুলকে লিখলাম আসতে—আজ চিঠি এসেছে—সামনে পরীক্ষা, কোন মতেই আসতে পারবে না···"

শাশুড়ি চুপ করিয়া গেছেন, কনকও একেবারে স্তম্ভিত—মানুষটির পেটে পেটে এই রকম জিলিপির প্যাঁচ!

একটু থামিয়া শ্বশুর আবার বলিয়া চলিলেন—"বরং একটু বুদ্ধি খাটিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে আরও দুঃখ করতে পার—আজকালকার ছেলের শুধু 'পাস-পাস' বাই হয়েছে—প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন, তুই আসতে না পারায় আমাদের যে কী কষ্ট হলো সেটা একবার ভেবে দেখবিনি?—আর তুইও তো কাকা—প্রথম ভাইপো তোর?···বৌমার

সামনে এই রকম করে বিনিয়ে বিনিয়ে বললেই তিনি মনে করবেন'খন প্রতুলই আসতে চাইলে না।"

শাশুড়ি চুপ করিয়া গেছেন; কনক যেন স্পষ্ট দেখিতেছে শাশুড়ি বোকা বনিয়া শ্বশুরের মুখের পানে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছেন।

কিন্তু এর উত্তরটা তো খুব সোজা, চিঠিতে কিম্বা যখনই প্রতুলের সঙ্গে দেখা হইবে ওঁদের বৌমার তখনই যে কথাটা ফাঁস হইয়া যাইবে। ছেলে-বৌয়ের সামনে মিথ্যাবাদী হওয়াটা কি এতই গৌরবের কথা? —এই সোজা প্রশ্নটুকু আর মাথায় আসিতেছে না শাশুড়ির?—অথচ এত বড় একটা সংসারের গিন্নি! এর ভেতরে শ্বশুরের যে কী মস্ত বড় চাল রহিয়াছে সেটাও বুঝিবার ক্ষমতা নাই?—ছেলে-বৌয়ের কাছে মিথ্যাবাদী হইতে শাশুড়িই হইলেন, শ্বশুর অনেক পাস দেওয়া চালাক লোক, দিব্যি আড়ালেই রহিয়া গেলেন—কেহ তো তাঁহার কাছে কথাটা ভজাইতে যাইবে না? পুরুষরা যে কত চালাক, এত দিন একসঙ্গে ঘর করিয়াও সে হদিস পাইলেন না শাশুড়ি। কী গো!···সত্যিই নেহাৎ যম-পুকুর করা বুদ্ধি!

শাশুড়ি যতই হাঁদার মতো চুপ করিয়া আছেন, উত্তরগুলা ততই যেন কনকের পেটে গজ-গজ করিতেছে, কনকের যেন ছটফটানি ধরাইয়া দিতেছে। কথাবার্তা নাই, সেইজন্য আড়ি-পাতিতেও ভয় হইতেছে,—যদি হঠাৎ দোর খুলিয়া বাহির হইয়া আসেন শাশুড়ি!

শ্বশুরই প্রশ্ন করিলেন—"কি, উত্তর দিচ্ছ না যে?"

শাশুড়ি চুপ করিয়াই আছেন। কনক আবার দম বন্ধ করিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল,—যাক্, রাগ করিয়াছেন শাশুড়ি, এও মন্দ নয়, বরং আরও ভালো, অবুঝ মানুষদের কাছে রাগই ঠিক অস্ত্র।

শ্বশুর আবার প্রশ্ন করিলেন—"বলি মুখ ঘুরিয়ে রইলে যে—কথাগুলো মনে ধরল না ?"

কোন উত্তর নাই। তীব্র উৎকণ্ঠায় কনক দাঁতে ডান হাতের একটা নখ প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়াছে, যেন তাহার শক্তিতে শাশুড়ির মনে শক্তিসঞ্চার হইবে।

শ্বশুর আর একবার তাগাদা দিলেন—"বলি, ধরল না মনে কথাগুলো ?"

"বড় মনে ধরবার কথা, তাই ধরবে মনে !"

—উত্তর না দিলেও ছিল ভালো আরও খানিকক্ষণ, তা' যাক্, ঝাঁজ আছে কথাগুলায় ; কনক সেই ভাবেই কান পাতিয়া রহিল।

শ্বশুর বলিলেন—"তার মানে ?"

"তার যা মানে তা বোঝবার ক্ষ্যামতা নেই তোমাদের। আমাদের লেখাতে আসতে চাইলে না শুনলে কি ফল হবে জানো !—একটু তলিয়ে দেখবার মতন বুদ্ধি আছে ?"

শ্বশুর একটু চুপ করিয়া যেন তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর হার মানিয়া বলিলেন—"না পারলাম না ; আমাদের একটু মোটা বুদ্ধি।"

"তা সত্যিই মোটা বুদ্ধি, গুমোরটাই সম্বল,—ঐ কথা যদি শোনেন তো ছোট বৌমা নিজে তাকে লিখবেন না ভেবেছ ? এই জন্তেই বলছিলাম..."

শ্বশুর একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"নিজে লিখবেন ! জানাজানি হয়ে যাবার ভয় নেই ?"

শাশুড়ি বিরক্ত ভাবে উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"কি গেরো গা !

এমন মনিষ্যির পাল্লায়ও পড়ে মানুষে!—ছেলে এসে কি তোমার কানে-কানে বলতে যাবে চিঠির কথা যে জানাজানি হবার…”

পা টিপিয়া টিপিয়া তাড়াতাড়ি নামিতে নামিতে সিঁড়ির মোড় পর্য্যন্ত কনক এইটুকুই শুনিল, তাহার পর দুয়ার খোলার শব্দ হইল।

২

সমস্ত দিন মুখটা এত শুকাইয়া রহিল কনকের যে লুকাইয়া-লুকাইয়া কাটাইতে হইল; বিশেষ করিয়া, আড়ি-পাতিতে গিয়া শাশুড়ির মুখের ভাব বুঝিবার যে-রকম ক্ষমতার কথা শুনিল। তবু কয়েক বার নজরে পড়িয়া যাইতে যে না হইল এমন নয়, মাথার ব্যথা বলিয়া কাটাইয়া দিল, তাহাতে শাশুড়ি এখন যাহাই বুঝুন না কেন, উপায় কি?

পরের দিন সত্যই মাথাটা একটু ধরিল, একটা মস্ত বড় আশা-ভঙ্গ তো?—বাপের বাড়ি থাকিতে প্রতুল অনেক দিন যায় নাই, এই একটা উপলক্ষে শ্বশুরবাড়ি যদি এত দিন পরে আসিল, শ্বশুর অমনি তাঁহার ছেলের পরীক্ষার জন্য দুশ্চিন্তায় পড়িয়া গেলেন! জগতে তাঁহার ছেলেই এক পরীক্ষা দেয়, আর তো কেহ দেয় না! এমন জানিলে কনক বাপের বাড়িই মাথাব্যথার নাম করিয়া পড়িয়া থাকিত।

মাথাটা ছাড়িল সন্ধ্যার পর। মনটা প্রফুল্ল হইয়াছে একটু, কনক খানিকটা এ-ঘর সে-ঘর করিয়া কাটাইল। কাজের বাড়ি, একটু-আধটু আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে, হাসিয়া, গল্প করিয়া কিছু কিছু কাজও

করিল। তাহার পর, মনে স্ফূর্তির হঠাৎ একটা স্রোত নামিলে যেমন হয়, যে-শ্বশুরের উপর রাগ আর অভিমান তাঁহারই জন্ত মনটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। এদিকে যাহাই হোক, বড় স্নেহশীল মানুষ— বিশেষ করিয়া কনককে বড় ভালবাসেন। কনকেরও এখানে থাকিলে ওঁর পরিচর্যাতেই কাটে বেশীক্ষণ—ঘরটি পরিষ্কার করা, জামা-কাপড় গোছানো, জল গড়াইয়া দেওয়া, তামাকটি সাজিয়া দেওয়া—এইসব।

কাল দুপুরে ওঁর ঘরে প্রবেশ করিতে গিয়া ঐ যে ব্যাপারটুকু হইল তার পর হইতেই সব ওলট-পালট হইয়া গেছে—প্রথমটা মাথা-ধরার ভাণই করিতে হইল, তাহার পর আজ সমস্ত দিন তো সত্যই গেল মাথা লইয়া।

শ্বশুরের জন্ত মনটা হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল কনকের। কিন্তু শ্বশুর বাড়িতে নাই; এই কিছুক্ষণ হইল চাকরটাকে লইয়া বাজারে গেলেন, যাইবার সময় জিজ্ঞাসা করিয়া গেলেন কনকের মাথাটা কি রকম আছে; কনক একটু মিথ্যা করিয়াই বলিল—আছে ভালো।

মনে হইল ততক্ষণ না হয় ঘরটা গুছাইয়া রাখি, কাল সকালে আসা হইয়াছে, এখন পর্য্যন্ত হাত দেওয়া হয় নাই। উপরে শোবার ঘরটায় গিয়া দেখিল, গোছানোই আছে। তবু আর একবার পরিষ্কার করিয়া বিছানাটা ঝাড়িয়া, আলনার জামা-কাপড়গুলা ঝাড়িয়া সমস্ত ঘরটা আরও একটু ভালো করিয়া ঝকঝকে তকতকে করিয়া দিল। বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল না, কেন না মনে সেবার যতটা স্পৃহা সে-অনুযায়ী সুযোগ তো পাওয়া গেল না। তখন অফিস-ঘরের কথা মনে পড়িল। ওটা একটু বাহিরের দিকে, তাহা ভিন্ন শ্বশুরের সঙ্গে যাহারা দেখা করিতে আসে, ওই ঘরেই বসে বলিয়া ওটা চাকরের হেপাজতেই থাকে।

তবে থাকে একটু নোংরা, বিশেষ করিয়া টেবিলটা; চাকরেরই হাত তো? সুযোগ পাইলে কনকও মাঝে মাঝে একটু গোছগাছ করিয়া দিয়া আসে।

এখন শ্বশুর নাই, ঘরটা খালি থাকিবে, কনক নামিয়া গেল।

আজ প্রায় দুমাস পরে ঘরটায় প্রবেশ করিতেছে। দেখিলে কান্না পায়। শ্বশুর সদাশিব মানুষ, তাহা ভিন্ন চাকরে কি করিল না করিল দেখিবার ফুরসৎও থাকে না, ঘরটার কি দুর্দশা হইয়া আছে! কয়েক জায়গায় ঝুল, পাশের দু'একটা জানালায় মাকড়শারও জাল পড়িয়াছে, কোণের দিকের চেয়ার আর কৌচগুলা যেন কতদিন ঝাড়নের সংস্রবে আসে নাই। ওদিকে টেবিল এক ড াঁই হইয়া রহিয়াছে, মেঝের ম্যাটিংটার দিকে চাওয়া যায় না। কোথায় যে আরম্ভ করিবে যেন ভাবিয়াই পাইল না কনক, এ আবর্জনা তো এক কথায় যাইবার নয়। তাহার পর স্থির করিল, এখন টেবিলটা গুছাইয়া ফেলা যাক, সকালে আসিয়া ঘরটার গতি করিবে, অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় না দিলে চলিবে না, তা'ভিন্ন এক জনের কর্মও নয়।

বাহিরের দিকের দরজা-জানালাগুলো বন্ধ করিয়া দিল, কেহ যদি শ্বশুরের খোঁজে আসে; তাহার পর বই কাগজের গাদাগুলো ঝাড়িয়া-ঝুড়িয়া এক দিকে জড়ো করিতেছে, হঠাৎ কতকগুলো আলগা কাগজের মধ্যে হইতে একটা চিঠি চোখে পড়িল। পরের চিঠি পড়িতে নাই, সচরাচর পড়েও না কনক, তবে শ্বশুরের হাতের লেখা দেখিয়া কেমন একটা কৌতূহল হইল; মুড়িয়া রাখিয়াছিল, মিনিটখানেক হ্যাঁ-না, হ্যাঁ-না করিয়া আবার ভাঁজটা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। লেখা আছে—

কল্যাণবরেষু—

বাবাজীবন, আগামী ২৫শে শ্রাবণ, বুধবার দাদুর অন্নপ্রাশনের দিন ধার্য করিয়াছি। ওর এই প্রথম কাজ, সাধ্যমত তোমরা সকলে উপস্থিত থাক আমার এইরূপ ইচ্ছা; অবশ্য যেখানে উপায় নাই সেখানে আর কি হইবে? নৈহাটি থেকে তটিনী আসিয়াছে, এই সঙ্গে বিমলকেও বৌমাকে লইয়া আসিতে লিখিলাম; আর সবাইকেও পত্র দিলাম। ছোট বৌমা পরশু আসিবেন, বেহাইয়ের পত্র এইমাত্র পাইলাম। বেশি ছুটি লওয়া ক্ষতিজনক মনে করো তো অন্তত দিন দু'য়েকের জন্য অতি অবশ্যই আসিবে। আসিবার সময় কিছু আনারস লইয়া আসিও চাটনির জন্য, এখানে পাওয়া যাইতেছে না।

অত্রস্থ সব কুশল জানিবে। আমার শুভাশিস গ্রহণ করিবে। ইতি

১৮ই শ্রাবণ, ১৩৫৩

অমরেশ দেবশর্মণঃ

চিঠিটা পড়িয়া একটু অভিমানই হইল কনকের;—দাদুর প্রথম কাজ, সবাই আসুক, সবাই আমোদ-আহ্লাদ করুক, শুধু এক জনের আসিয়া কাজ নাই, সে পরীক্ষা লইয়া মাথা কুটুক! বাপ হইয়া যে মানুষে কি করিয়া এতটা আক্কেল খোওয়াইতে পারে, কনকের মাথায় আসিতেছে না। অন্যমনস্ক ভাবে রাখিয়া দিতে যাইতেছিল চিঠিটা, তাহার পর নিচের তারিখটার পানে আর একবার নজর পড়িয়া গেল। ১৮ই শ্রাবণ; আজ হইল ২১শে, তাহা হইলে ১৮, ১৯, ২০, ২১—চারদিন আগেকার চিঠি।

কনকের ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল,—এ কি রকম হইল? চার

দিন আগেকার চিঠি এখনও পড়িয়া আছে, তাহা হইলে মেজ বড়ঠাকুরকে চিঠি পাঠানই হয়নি—না কি। মনটা খুশি হইল কি দুঃখিত হইল ঠিক মতো বুঝিতে পারিল না—একটা এমন আহ্লাদের কাজে এক জনকে না আসিতে দিবার দিকেই যাঁদের সমস্ত মনটা ঝুঁকিয়া আছে তাঁদের এ ভুল হওয়াই ভালো। তাহার পর কিন্তু দুঃখই হইল মনে, আহা মেজ বড়ঠাকুর আসিতে পারিবেন না! তাঁহার দোষটা বা কি? হয় তো সময়ে আসিলে এই যে একটা অন্যায় হইতেছে তাহারও প্রতিবাদ করিতে পারিতেন, অন্তত একটা দিনের জন্যও প্রতুলের আসা হইত। আর আনারসও আসিল না…আনারসের চাটনি…মুখটি সজল হইয়া আসিয়াছে, একটি ঢোঁক গিলিয়া আবার ভাবিতে লাগিল কনক।

—ভুলের কথাটা শ্বশুরকে একবার বলা দরকার নয় কি?…কিন্তু তাহা হইলে চিঠি খুলিয়া পড়ার কথাটাও যে আপনি আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়ে—সে যে একটা অমার্জনীয় অপরাধ—বিশেষ করিয়া শ্বশুরের চক্ষে; কি করা যায়? চিন্তাটা যেন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না।

তাহার পর ওদিকে বাধা পাইয়া চিন্তাটা হঠাৎ অন্য এক পথ ধরিল। কনকের বুকটা সজোরে ধক্ ধক্ করিতে লাগিল, দাঁতে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে ঘাড়টা ঈষৎ বাঁকাইয়া স্থিরদৃষ্টিতে চিঠিটার পানে চাহিয়া রহিল।…যদি তাহাই করা যায় কেমন হয়?

—চিঠিটা কনক ধীর মনে আরও বার দুয়েক পড়িয়া গেল; না, কোনখানেই এমন কিছু নাই যাহাতে মনে হয় মেজ বড়ঠাকুরকেই লেখা হইতেছে এ চিঠি—এমন সাধারণ ভাবে লেখা যে শ্বশুরের যে কোন বাবাজীবনের নিকটেই পাঠানো চলে। যদি মেজর নিকট না গিয়া ছোটর নিকটেই যায় তো ক্ষতিটা কি?

কনকের বুকটা ধড়াস ধড়াস করিতেছে, ভ্রূ দু'টি হইয়া উঠিয়াছে আরও কুঞ্চিত।

—দোষটাই বা কি এমন? মেজ বড়ঠাকুরের কাছে চিঠিটা পৌঁছিল না—এই তো? তা…

চিন্তা আবার অনুকূল হইয়া উঠিল, একটা আলোক-রেখা পাওয়া গেছে: মেজ বড়ঠাকুরের কাছে চিঠি যে যায় নাই তাহার মানে কি?—এ চিঠিটা পড়িয়া আছে বলিয়া অন্য চিঠি যে যায় নাই এমন তো প্রমাণ হয় না…বেশ, না হয় যায় নাই-ই, মেজদিদি আছেন, হপ্তায় দু'খানা করিয়া চিঠি-ই লেখা চাই তাঁহার মেজ বড়ঠাকুরকে,—অন্নপ্রাশনের কথা লিখিতে ছাড়িয়াছেন না কি?…না হয় খুব খারাপের দিকটাই ধরা যাক্—ধরো বাবার চিঠি না পাওয়ায় মেজ বড়ঠাকুরের অভিমান হইল; আসিতে চাহিলেন না, কিন্তু সেটাও তো মেজদিদি ওঁর চিঠিতে জানিতে পারিবেন—এই আজ-কালের মধ্যেই সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুরের কানে পৌঁছিবে কথাটা, সঙ্গে সঙ্গে চিঠি যাইবে—বেশি দেরি হয়, টেলিগ্রাম—তার চেয়েও বেশি দেরি হয়, জরুরী টেলিগ্রাম…

নাঃ ক্ষতিও নাই, দোষও নাই।

কনক টেবিল-দেরাজের মধ্য হইতে একটা খাম বাহির করিল। প্রতুলের নাম লিখিল, তাহার মুখটি চুণ হইয়া গেল; কনকের হাতের লেখা যে চেনা প্রতুলের।—প্রতুল বলে, পৃথিবীতে এত চেনা আর কিছুই নাই তাহার।

আবার চিন্তা, তাহার পর ও-খামটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া কনক আর একটা খাম বাহির করিয়া তাহার লেখার ছাঁদ থেকে যতটা সম্ভব দূর এবং শ্বশুরের ছাঁদের যতটা সম্ভব নিকট করিয়া নাম ঠিকানা আবার

লিখিল।...এই বেশ হইল, অত ভাবিলে চলেও না; তাহা ভিন্ন প্রতুলের এখন পরীক্ষার ভাবনাতেই মাথা ঘুরিতেছে—খামে কাহার হাতের ছাঁদ তাই দেখিবার যেন কত ফুরসৎ! আসল চিঠিটা যে বাবার ঐটুকু জানিতে পারিলেই যথেষ্ট।

তাহা হইলে এ-ঘরে আর নয়। কনক যে এ-ঘরে আসিয়াছে কেহ জানিতে পর্যন্ত পারে নাই এখন পর্যন্ত, উপর হইতে নামিয়া বাহিরে বাহিরেই চলিয়া আসিয়াছে, দেখিয়াছে এক মেজ জায়ের ছোট ছেলে—সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়।

কনক যেটুকু গোছগাছ করিয়াছিল আবার আগেকার মতো বিশৃঙ্খল করিয়া রাখিল, তাহার পর দোরের শিকলটা চড়াইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। বুকটা সেইরকম ধড়াস ধড়াস করিতেছে, পা দুইটা একটু একটু কাঁপিতেছে। এখন বাকি রহিল শুধু চিঠিটা পোস্ট করা। টিকিট জুটিল না, তা সে এমন কিছু একটা বাধা নয়, বরং শুনিয়াছে বেয়ারিং চিঠি যায়ও ভালো, হারায়ও না।

এ-বাড়িতে চিঠি ফেলিবার সুবিধা খুব, নিজেদের যে নারিকেল গাছটা ঠিক গেটের বাহিরে রাস্তার দিকে হেলিয়া উঠিয়া গেছে তাহারই গায়ে তার দিয়া চিঠির বাক্সটা টাঙানো। লোভ হয় টুপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া আসি; গলিতে লোক-জন নাই এখন, এদিকটা অন্ধকারও হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু যাওয়ার চিন্তাতেই পা দুইটা আরও কাঁপিতে লাগিল—বৌ-মানুষ, দু'পাও তো রাস্তায় নামিতে হইবে; ওরে বাবা!—সে হয় না; মরিয়া গেলেও নয়।...এ-ভাবে দাঁড়াইয়া থাকাও যায় না, কাল যা হয় একটা ব্যবস্থা হইবে।

যেমন আসিয়াছিল, বাহিরে-বাহিরেই দোতলায় উঠিয়া অপর দিক দিয়া

নামিয়া যাইবে, পা বাড়াইয়াছে, একটু ওদিকে সদর দরজার সামনে যে দেওয়াল তাহার ভিতর হইতে সইয়ের বাড়ির ঝি বাহির হইয়া আসিল। কনক ডাকিল—"কে গো, সৌরভী না কি?"

সৌরভী কাছে আসিল, প্রশ্ন করিল—"তুমি এখানে ছোট বৌদি?"

"এই বাবার ঘরটা এক ডাঁই হয়েছিল, একটু গোছাচ্ছিলাম…তুই একটা কাজ করতে পারবি?"

"কি?"

"এই চিঠিটা সৌরভী—ফেলে দিয়ে যা।"

একটু লজ্জিত ভাবে হাসিয়াই ফেলিল; চিঠিটা দিতে গিয়া হাতটা একটু টানিয়া লইয়া বলিল—"কিন্তু কাকেও বলতে পারবিনি—তা যদি বলিস তো থাক্ বাপু…সইকেও বলতে পারবিনি, আমার দিব্যি রইল।"

সৌরভী হাসিতে হাসিতে হাতটা বাড়াইয়া বলিল—"দেও, দেও, অত যদি হালকা হোত সৌরভী তো কোন গিন্নীর চিঠিই কোন কত্তার কাছে পৌঁছুত না।…এই ঠাকুরের ঘর পরিষ্কার করা! তাই তো বলি ছোট বৌদি এমন সময় এখানে দাঁড়িয়ে কেন!…দেও।"

চিঠিটা লইয়া হাসিতে হাসিতেই বলিল—"জবাব এলে কিন্তু আমার বকশিস চাই, তাতে ফাঁকি দিউনি যেন।"

"তুই কালই নিয়ে যাস্ তোর বকশিস, ধার রাখি না"—হাসিতে হাসিতে কথাটা বলিয়া কনক একটু অগ্রসর হইয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল, সৌরভী চিঠিটা ছাড়িয়া দিলে আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া গেল।

৩

অর্ধেক সিঁড়িও ওঠে নাই, একটা কথা মনে পড়িয়া কনকের সমস্ত শরীরটা যেন হিম হইয়া গেল,—প্রতুল আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই যে সব কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহার কি ব্যবস্থা হইল? শ্বশুর-শাশুড়ি যাহার সঙ্গেই আগে দেখা হোক আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিবেন। শ্বশুর যা মানুষ, হয়তো রাগিয়াই যাইবেন, তখন যে চিঠির কথা আপনিই বাহির হইয়া পড়িবে, কাছে থাকিলে চিঠিটা বাহির করিয়াই সামনে ধরিবে যে প্রতুল। এ কি হইল? উপায় এখন?

ছাতে খোলা হাওয়ায় একটু পায়চারী করিতে করিতে প্রথম আতঙ্কের ভাবটা কাটিয়া গিয়া একটু সাহসও ফিরিয়া আসিল, মাথাটা পরিষ্কার হইয়া একটু বুদ্ধিও খুলিল,—অত ভাবিবার কি আছে? গেছে তো শ্বশুরেরই চিঠি—কি করিয়া গেছে লোকে কেমন করিয়া টের পাইবে? মিছে ভাবা, মিছে ভয় কনকের যেন একটা বাতিক দাঁড়াইয়াছে!

সব দুশ্চিন্তা কাটিয়া গিয়া প্রতুল যে আসিবে এর আনন্দটুকু কনকের সমস্ত মনটিতে বেশ চারাইয়া পড়িয়াছে। আরও একটু পায়চারী করিল, ঝিরঝিরে দক্ষিণে হাওয়াটা আরও মিষ্টি লাগিতেছে যেন। ওদিকে নিচের বাড়িতে কে প্রশ্ন করিল—"ছোট বৌমাকে দেখছি না যে?"

বৌ মানুষ, এত দূর থেকে উত্তর দেওয়া যায় না, কনক ওদিক দিয়া

নামিতে যাইবে, শ্বশুর উঠিয়া আসিলেন। বলিলেন—"এই যে বৌমা, ছোট বৌমা এখানে। কি করছিলে মা একা একা ?"

কনক বলিল—"আপনার শোবার ঘরটা একটু পরিষ্কার করছিলাম বাবা।"

"এসো, মায়ে বেটায় একটু গল্প করিগে; তোমার বাপের বাড়ির কথাও জিগ্যেস করা হয়নি। মাথাটা ছেড়েছে তোমার ?"

দু'জনে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

কনক একটু অন্যমনস্ক হইয়া একটা কথা ভাবিতেছিল, প্রবেশ করিয়া টেবিলে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, কণ্ঠটাকে খুব সহজ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"আছেন ভালো বাবা সবাই ; হ্যাঁ, মাথাটা ছেড়েছে। হ্যাঁ, ভালো কথা মনে পড়ে গেল, অন্নপ্রাশনে আসবার জন্যে মেজ বড়ঠাকুর আর সেজ বড়ঠাকুরকে আসতে লিখেছেন বাবা ?"

"হ্যাঁ মা, লিখেছি, কেন বলো তো ?"

"না, তাই জিজ্ঞেস করছি, কেউ এলেন না এখনও, কাজের বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে। ভাবছিলাম—ভুলে যাননি তো লিখতে বাবা..."

"না ভুলিনি, তবে একটু ভুল হয়েছিল বটে বিকাশের চিঠি নিয়ে।"

কনক প্রবল কৌতূহলটা চাপিবার চেষ্টা করিয়া মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"কি বাবা ?"

"বিকাশকে একখানা চিঠি লিখে কোথায় যে ফেললাম—চিঠিগুলো পোস্ট করতে গিয়ে দেখি তার খানা নেই, তখন আর একখানা লিখে পোস্ট করে দিলাম—আর একটু হলে ছেড়ে গিয়েছিল আর কি—অনেকগুলো চিঠি এক সঙ্গে—মাথার ঠিক থাকে না আর...বাবা তো

তোমার বুড়োও তো হতে চল্লো মা…"

তাহার পর হঠাৎ তাঁহার চৈতন্য হইল—এত প্রশ্নের অর্থটা কি ? মুখটা একটু কেমন হইয়া গেল যেন, কথাটা বলিতে বাধিল, তবুও স্খলিত কণ্ঠে বলিলেন—"ইয়ে—তোমার গে—সবাইকেই আসতে বলা হয়েছে, শুধু বলা হয়নি প্রতুলকে—তোমার গিয়ে ভাবলাম…"

বউটি বড় আদরের, অনেক কথা নিঃসঙ্কোচেই বলে। কনক শ্বশুরের মুখের কথা এক রকম কাড়িয়া লইয়াই বলিল—"তা সে ভালোই করেছেন বাবা। সামনে পরীক্ষা, হুট করে চলে আসা… আর অন্নপ্রাশন এমন কি ব্যাপার বলুন না—খোকা বেঁচে থাক্, আসবার ঢের সময় আছে…আমার তো এই মত…"

একটি প্রসন্ন হাসিতে শ্বশুরের মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জামা-জুতা ছাড়িতে ছাড়িতে অনেক কথা হইল এর পর—বেশির ভাগই পড়াশুনা, পাস করা উন্নতি করা—তাহার জন্য সংযম, তপস্যা এই সব লইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত। কনক নিচে আসিবার সময় শ্বশুর বলিলেন —"তোমার শাশুড়িকে একবার ডেকে দেবে বৌমা।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কনকের মনটা একটি আনন্দের আবেগে ছল-ছল করিয়া উঠিতে লাগিল,—শাশুড়িকে ডাকিতে বলা কেন সে জানে,—এইবার বধূর প্রশংসায় শ্বশুর পঞ্চমুখ হইয়া উঠিবেন— "তুমি ঐ বললে তো ?—আর বৌমার কথা শোন—'বেশ করেছেন বাবা

আসতে বললাম, পাসের পড়া সহজ নয় তো—খোকা বেঁচে থাক্, আপনার ঢের সময় হবে'...সে কথার কি বাঁধুনি মায়ের আমার...আমি নিজে পছন্দ করে বৌ করেছি, এমন নাকি!...”

—আজ সব কথাই থাকিবে বন্ধ, চলিবে শুধু ছোট বৌমার গুণগান।



রেলে

গাড়ির সেকেণ্ড ক্লাসের কথা হইতেছে, থার্ডও নয়, ইণ্টারও নয়।

ব্ল্যাক-আউট ; আলোর কাচে কালো রং লেপা নয়, আলোর পাটই নেই একেবারে। দু একজনের হাতে টর্চ আছে, নিতান্ত সেরকম প্রয়োজন হইলে এক একবার ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে, ব্যাটারির বাজারও যে চড়া। তাও কি পাওয়া যায় ? স্থানাভাবের চেয়েও আলোর অভাবটাই বড়—সেই একই গাড়ি, কিন্তু দিনের চেয়ে রাত্রে যেন চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর হইয়া পড়ে। আলোর চর্চাই বেশি। কেহ বলিতেছে, ব্ল্যাক-আউটটা গভর্ণমেণ্টের হুকুমেই। কেহ বলিতেছে, বাল্ব্ চুরি যায় এক আধটা, তাহার পর কোম্পানী সবগুলা খুলিয়া লইয়াছে, বলে—এবার তোরা কি চুরি কর্‌বি কর্‌। নানারকমের মন্তব্য। এমন ভাবে বলে যেন গাড়ির সংখ্যা কমাইয়া কোম্পানির এবার খদ্দেরের সঙ্গে একটু ঠাট্টা করিবার ফুরসৎ হইয়াছে।

ভিড়ের লেখা জোখা নাই ; বেঞ্চ বাঙ্কগুলা তো ঠাসা, মাঝখানের

খালি জায়গাটুকুতে বাক্স, ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বিছানা, চাঙারি, বাসনপত্র প্রভৃতির একটা ছোটখাট পাহাড়,—জনহীন নয়, তাহার উপরও যে যেখানে পাইয়াছে আশ্রয় করিয়া লইয়াছে। মাঝে মাঝে এক আধ জন স্থানচ্যুতও যে না হইয়া পড়িতেছে এমন নয়। গাড়িতে বরাবরই যে একটা হট্টগোল রহিয়াছে, এ ক্ষেত্রে সেটা বাড়িয়া যাইতেছে। খানিকটা ঝগড়া, বচসা, অভিশাপ আবার খানিকক্ষণের জন্য হয় তো একটু ঠাণ্ডা ভাব। দার্শনিক গোছের যাত্রীরও অভাব নাই।—"কেন ব্রাদার, একটু সরেই যাও না, কদণ্ডই বা?"…"ঠিকই বলেছেন, আর আমাদের জীবনটাই কি এই রকম নয়? কোথা থেকে আসছি কোথায় চলেছি —একটুখানির জন্যে দেখা—"…"তাও দেখাই বা কোথায় মশাই? জীবনটাই কি ব্ল্যাক-আউট্ নয়? সবাই কি অন্ধকারে হাতড়ে মরছি না? বলুন…"

অন্ধকার আর হট্টগোলের মধ্যে বোঝা যায় না কে বলিতেছে বা কোথা থেকে বলিতেছে, অভিমতের গুরুত্বে মনে হয় যেন দৈববাণী হইতেছে।

আসলে ইহাদের বোধ হয় টিকিটই নাই; চায় না যে একটা দাঙ্গা ফ্যাসাদ হোক, কেহ চেন টানিয়া দিক, গার্ড বা চেকার আসুক। হয়তো ইচ্ছা করিয়াই যে টিকিট লয় নাই এমন নয়, পাওয়াও অনেক সময় অসম্ভব তো? কিন্তু সে কথা কি শুনিবে? হয়তো মাঝপথেই এই মাঠের ওপর নামাইয়া দিবে—যা অরাজকতার যুগ চলিয়াছে।… মানুষ সর্ব্বদাই ত্রস্ত, সবাইকেই সন্দেহ; বাঁচা তো নয়, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভব বিপদকে ঠেকাইয়া রাখা—কোথাও ধর্ম্মোপদেশ দিয়া, কোথাও হুমকি দিয়া, কোথাও পায়ে ধরিয়া—যেখানে যেমনটা খাটে।

গাড়ি প্ল্যাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইতেই কিন্তু দার্শনিক-অদার্শনিক শত্রু-মিত্র—সবার কণ্ঠে এক রব উঠিল—"না, না, না, জায়গা নেই, অন্য গাড়ি···দোর চেপে ধরো, খবরদার, জানলা তুলে দাও!···"

প্ল্যাটফর্মেও ব্ল্যাক-আউট। বহু দূরে দূরে লম্বা চোঙার মধ্য দিয়া গুটি চারেক আলোর বৃত্ত এখানে ওখানে পড়িয়া আছে স্তম্ভগুলির তলা ঘেঁসিয়া। তাদেরও যেন আশ্রয় জড়াইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকা,—গাড়ির সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই।

বাহিরের দলও যেন একটা চাপ বাঁধিয়া গাড়িটাকে আক্রমণ করিয়াছে, ঠিক যেন একটা দুর্গ অবরোধের ব্যাপার, দুয়ারে লাথি, জানালায় ঘুষি, হুমকি; এদিকে আবার যা মিনতি আছে তার কারুণ্যে পাষাণ গলিয়া যায়।

একজন লোক হন্তদন্ত হইয়া শেষদিকের জানালায় কয়েকটা টান দিল, কোন রকম সাড়া শব্দ না হওযায় ঝিলমিলির মুখ দিয়া বলিল—"আমি ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার, শীগগির দিন খুলে দয়া করে, জানলা গলেই না হয় ঢুকে পড়ি, একটু সাহায্য করুন, দোহাই···"

জানালা দিয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে উত্তর আসিল—"এটা সেকেণ্ড ক্লাস"।

"জানি; ফার্স্ট ক্লাসে জায়গা নেই।"

"সে অপরাধ তো সেকেণ্ড ক্লাসের নয়।"

"খুলবেন না জানলাটা?"

আর উত্তর হইল না।

বড় স্টেশন, অবরোধের চাপটা ক্রমেই বাড়িতেছে। ভিতরের প্রতিরোধও আরও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। হঠাৎ একটা বড় টর্চের আলো দুয়ারের উপর আসিয়া পড়িল। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীটি খুঁজিয়া পাতিয়া একজন ক্রু-ম্যানকে ডাকিয়া আনিয়াছে। সে আসা মাত্র বাহিরের ভিড় অনুরোধ উপরোধ অনুযোগ লইয়া তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। উগ্র প্রয়োজন ভিন্ন আজকাল আর কেহ আর রেল-যাত্রা করে না, একটা যেন অবলম্বন পাইল।

ক্রুম্যান আর একবার ভিতরের দিকে টর্চটা ফেলিয়া ভালো করিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বলিল—"দোরটা ছেড়ে সরে দাঁড়ান, ভেতরে আসব।"

কয়েকজন ভিতর থেকে রুখিয়াই উঠিল—"এর মধ্যে আর কি করে লোক ঢোকাবেন আপনি?"

কিন্তু আওয়াজে আর সে রকম জোর নাই, বোঝা যায় প্রথমেই যাহারা না-না করিয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের অনেকেই নীরব।

ক্রুম্যান ভিতরে ঠেলিয়া উঠিয়া বলিল—"আপনাদের টিকিট।"

প্রথমেই একজন থার্ড ক্লাসের যাত্রী। বলিল—"এটা সেকেণ্ড ক্লাস করে দিন।"

"আপাতত আপনাকে নিচে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। যাদের সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট তাদের জায়গা হয়ে বাঁচলে, আপনার ব্যবস্থা করতে পারি।"

নামিতে হইল। তাহার পিছনে পিছনে আরও অনেককে। গম্ভীর নিঃশব্দতার মধ্যে গাড়িটা খালি হইয়া আসিতে লাগিল।

যা অবস্থা; গাড়িতে ওঠায় সত্যই একটা দুর্গ জয়ের আনন্দ হয়। শুধু তাই নয়, একটু বিদ্রূপ, একটু বক্র হাসি দিয়া জয়ের আনন্দটাকে

আরও তীব্র করিয়া লইতে ইচ্ছা করে। যুদ্ধের দানব তো শুধু অস্ত্র লইয়াই ব্যাপৃত নয়, তাহার গরলও যে মনে মনে ছড়াইয়া দিয়াছে!… যে লোকটি ক্রুম্যানকে ডাকিয়া আনিয়াছিল সে তখনও প্লাটফর্মে; বিজয় হাতের মধ্যে, নামিবার হাঙ্গাম থামিলে উঠিয়া হাত পা ছড়াইয়া বসিবে। সেই জানালাটি এখনও বন্ধ, মনে হইতেছে এঁরও এই অবস্থা —হয় থার্ড বা ইণ্টার ক্লাস, নয় একেবারে মূলে হাবাত।

একটা অদ্ভুত ধরণের আনন্দ মনে হইতেছে। এই আনন্দও যুদ্ধেরই দান, কতকটা তাহাদের আনন্দের মতো যাহারা চোখের সামনে অনাহারে মানুষের মৃত্যুর পাশে পাশে নিজেদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স স্ফীত হইতে দেখিয়াছ। এত বড় যুদ্ধ মানুষের এত জিনিস লইতেছে, প্রতিদানে কিছু নূতন দিবে না?

জানালায় দুটি ঘা দিয়া বলিল—"এবার খুলুন না জানলা মশাই।"

কোন উত্তর নাই—লোকটা কোনে ঘেঁসিয়া বসিয়া আছে, চিন্তান্বিত, পরাভূত। ওদিকে ক্রুম্যান বাছাই করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ জানালাটা উঠিয়া গেল। ভিতরের লোকটা হাতটা বাহির করিয়া বাহিরের লোকটির হাতটা চাপিয়া ধরিল, বলিল—"বাঁচান, আমায় যেতেই হবে—মেয়েটার ভয়ানক অসুখ…টিকিট কিনতেই পারিনি… টেলিগ্রাম পেয়ে…!"

"ভ্যালা বিপদ! আমি কি করে বাঁচাতে পারি মশাই? আর বাধলও না তো অনুরোধ করতে। তখন যদি জানলাটা খুলে দিতেন তাহলে তো আমি ক্রু ডাকতে যাই না…"

"একটুও জায়গা ছিল না; তা'ভিন্ন মনের অবস্থাও খারাপ। তার

ওপর ভিড়ে অন্ধকারে—আর প্রত্যেক স্টেশনেই লোক ঠেকাতে ঠেকাতে…"

"কিন্তু আমি কি করে বাঁচাব আপনাকে, রেলের লোক নয় যে…"

ভদ্রলোক হাতটা চাপিয়া ধরিয়াছে, অত্যন্ত ব্যাকুল কণ্ঠে শুধু বলিল, —"দেখতে পাব না মেয়েটাকে—দোহাই আপনার…"

এমন সময় ক্রুম্যানের টর্চটা মুখের উপর আসিয়া পড়িল।

"আপনার টিকিট মশাই?"

"দেখুন—ইয়ে—মানে—টিকিটটা কিনতে…"

লড়াইয়ের আবহাওয়ায় মানুষের মাথায় যেন খুন চাপিয়া যায় মাঝে-মাঝে; স্বার্থের সংঘাতে যেন হঠাৎ নিজেকে ভুলিয়া যায়, মরিয়া হইয়া পশু হইয়া ওঠে। কিন্তু সে ক্ষণিক, আবার মানুষ নিজেকে লয় চিনিয়া, ভুর্গ জয়ের চেয়েও বড় জয়ের কথা মনে পড়িয়া যায় তাহার। ক্ষণিক মৃত্যুর হাত এড়াইয়া সে আবার মানুষ হইয়া বাঁচিয়া ওঠে।

প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে একটা শব্দ উঠিল—"গদাধরবাবু! ও গদাধর বাবু!" যেন কে অন্বেষণ করিতেছে।

গাড়ির লোকটি একটু সচকিত হইয়া ক্রুম্যানের দিক থেকে এদিকে দৃষ্টি ফিরাইল। বাহিরের সেই ভদ্রলোকটি। যেন খোঁজাখুঁজিতে একটু ক্লান্ত এইভাবে অল্প অল্প হাঁপাইতেছে। হাতে একটি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট; বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—"এই নিন্ আপনার টিকিট।"

ক্রুম্যান টিকিট চেক করিয়া নামিয়াই গেল।

কুলি হোল্ড-অল আর সুটকেসটা তুলিয়া ফেলিয়াছিল, ভদ্রলোক নামাইতে হুকুম দিলেন। ভিতরের ভদ্রলোকটি বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"আর আপনি? নিজের টিকিটইতো দিলেন দেখছি—"

সেকেণ্ড বেল হইয়া গিয়াছিল পূর্ব্বেই, গাড়িটা ছাড়িয়া দিল। ভদ্রলোক গলা উঁচাইয়া বলিলেন—"ঠিক আছে, ভাবতে হবে না; মেয়েটি কিরকম থাকে কিন্তু একটু খবর দেবেন—সেকেণ্ড মুন্সেফ—অবলাকান্ত মজুমদার।"



ফুলেশ্বরী

১

বনেদী ঘরের মেয়ে হওয়া খুবই ভালো, কিন্তু তাহার আর একটা দিকও আছে। মনে হয় আমি আকাশের চাঁদ, আমাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করা আর আকাশের চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়ানো একই কথা।

ফুলির কথা হইতেছে, পুরো নাম ফুলেশ্বরী দাসী। ফুলির বাপ অর্জ্জুন বৈরাগী ডাক-গাড়ির ইঞ্জিনে কয়লা যোগাইত। কতদিন যাবৎ বলা শক্ত, তবে জ্ঞান হওয়া থেকে বয়স যখন বারো-তেরো তখন পর্য্যন্ত ফুলি বরাবর দেখিয়া আসিয়াছে গায়ে নীল জামা, একটা প্রকাণ্ড হাতা করিয়া বাবা ইঞ্জিনের পেটের মধ্যে কয়লা ছুঁড়িয়া দিতেছে। এক মুহূর্ত্তের দেখা; কিন্তু তাহারই জন্য, মজা পুকুরের তালগাছগুলার ঠিক মাথার উপর সূর্য্যি-ঠাকুর যখন নামিয়া আসিত সমবয়সী সব ছেলেমেয়েদের লইয়া ফুলি রেলের গুমতির লোহার ফটকটায় বুক চাপিয়া দাঁড়াইত। ডাকগাড়ি আসিবে, গুমতির চৌকিদার 'ডিব্‌টি'র জন্য উর্দি চড়াইতেছে, নানারকম স-সম্ভ্রম প্রশ্ন—"ওরা বলছেল—শীগ্‌গির একদিন

লাট-সায়েব যাবার কথা আচে, কবে গা তারু চাচা ?...তুমি যে আজ পগ্ গোও বাঁধলে মাথায় ; আজই এসবে নাকি, অ্যাঁ তারু চাচা ?"

লাল পতাকাটা গুটাইয়া আর সবুজটা মেলিয়া বেশ ভালো করিয়া একবার ঝাড়িয়া লইয়া তারু শেখ সামনে আসিয়া দাঁড়াইত, বলিত—"লাটের অতশত খবর রাখবার ফুরসৎ নেই আমার, গাড়ির লাট ডাকগাড়ি এসছে, তাইতেই মাথা গুলিয়ে দেছে। খবরদার তোরা ফটক টপকে এসবিনি, আমার মন থাকবে অন্তদিকে ; যদি টেনে লেয় কাউকে তো সামলাতে লারব।"

"আজ কি গাড়ি নেট আছে তারু চাচা ?—তাই মনে হচ্ছে যেন..." ফটকের মধ্য দিয়া সকলে দূরে চাহিয়া থাকিত। জবাবটা দিত ফুলি—"জানিস না শুনিস না, যা তা বকিস নি—লোকে মনে করবে জানে না শোনে না, যা তা বকচে ;—বাবার গাড়ি নাকি লেট থাকতে পারে...তাও আবার 'নেট' !...ঐ ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে।"

না দেখা গেলেও কেহ প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, উত্তর হইত—"হিঁ উই লি-লি !..."

তাহার পর এক সময় সত্যিই যেন লি-লি করে একটি কৃষ্ণ রেখা সে-ই স্টেশনের ওদিকে, একেবারে বহুদূরে—তাহার পর স্পষ্ট ধুঁয়ার কুণ্ডলী—তাহার পর ইঞ্জিনের মুখ, একটু কাঁপিয়া কাঁপিয়া আগাইয়া আসিতেছে, শব্দও একটু একটু করিয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—একটা হুইসিল দিল, এইবার স্টেশনে ঢুকিবে, দূর থেকে দেখা যায়—প্লাটফর্মের ধারের দিকে যাহারা দাঁড়াইয়া, সরিয়া মাঝের দিকে চলিয়া আসিল ; যাহারা বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল—ডাকগাড়ি গাড়ির লাটই কিনা, এ-সব ছোট খাটো স্টেশনের দিকে ঘুরিয়াও চাহিবে না—দাঁড়ানো

তো দূরের কথা।…গুমতির এরা গেটের লোহা আরও কষিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল; তারুশেখ পতাকা মেলিয়া ঠিক মাঝখানটিতে দাঁড়াইয়া বলিল—"খবরদার। রাক্‌সে ইঞ্জিন, যদি টেনে লেয় কাউকে তো না হক্ হেড আপিসের সঙ্গে নেকা-নেকিতে পড়ে যাব।"

হুস, হুস, হুস, হুস—স্টেশন পার হইয়া গেল—ধূলির একটা ঘূর্ণি তুলিয়া দিয়া,—তাহার পর এই আরও কাছে, আরও কাছে—ইঞ্জিনটা কাঁপিতেছে যেন ছিটকাইয়া বাহির হইয়া আসিবে—ভয়ের কিছু না থাকিলেও ভয়ে সবাই গেট ছাড়িয়া দুই পা করিয়া পিছাইয়া আসিল—ফুলি উদ্বেগে আনন্দে দুইটা মুঠা গলার ঠিক নিচেটিতে চাপিয়া বলিয়া উঠিল—"উই বাবা!"

—একটি মুহূর্ত—অর্জুন বৈরাগী—গায়ে নীল জামা, মুখে ইঞ্জিনের পেটের আলো আসিয়া পড়িয়াছে, প্রকাণ্ড একটা হাতা করিয়া দিল এক হাতা কয়লা ছুঁড়িয়া সেই জ্বলন্ত পেটের মধ্যে—দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সবটা আবার অদৃশ্য হইয়া গেল।

প্রতিদিনের জীবনে এ একটা এত বড় ঘটনা যে সকলেই খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিত।…প্রথমে ফুলিই কথা কহিবে, সবটা কাণ্ড তাহার বাবারই তো? এক এক দিন, কি মনে হইলে তারুশেখও করিত গল্প-সল্প; এক একদিন গা-ঝাড়া দিত, দলটি ছাতিম তলায় সাঁকোর উপর গিয়া জড়ো হইত, মজা পুকুরের তালবনের পিছনে সূর্য রাঙা হইয়া আসিত, বাপের মুখে শোনা, ডাকগাড়ির ঐ ইঞ্জিনের নূতন নূতন গল্প শোনাইয়া সবাইকে অবাক করিয়া তুলিত ফুলি।

২

এ গেল ফুলির ছেলে বেলাকার কথা। তাহার পর অনেক বৎসর কাটিয়া গেছে এবং অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অর্জুন বৈরাগী মারা গেছে, ফুলির দাদা অভিরাম ডাকগাড়ির ইঞ্জিনের খোরাক যোগায়। অভিরাম যে শুধু বংশগৌরবই বজায় রাখিয়াছে তাহা নয়, তাহার ইঞ্জিনও তেমনি,—আঠার খানা চাকার উপর থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে, আর কী দৌড়—ইস্টিশান যখন পেরোয়, এখানে গুমতি পর্যন্ত যেন কাঁপিতে থাকে! দু'নম্বর, তারুশেখের জায়গায় গুমতি-ম্যান্ এখন বৃন্দাবন। তিন নম্বর, ফুলির এখন ভরা বয়স। চার নম্বরের পরিবর্তনও হওয়া উচিত ছিল একটা, অর্থাৎ ফুলির বিবাহ; কিন্তু সেটা এখনও হয় নাই। না হওয়ার একটা কারণ—তদ্বির করা চাই তো? কিন্তু করে কে? অভিরামের যা কাজ, একেবারেই ফুরসৎ নাই; সপ্তাহে ক'দিন তো বাড়ি আসিতেই পারে না, যে কটা দিন আসে বাড়িতেই নেশা করিয়া পড়িয়া থাকে। প্রতিবেশিনীরা অভিরামের বউকে বলে—"নিজের খোজা খুঁজি করবার অব্সোর নেই, তা পাড়ার পাঁচজন মাতব্বরের কাছে যাক্, ধরুক্; বয়েস, না, বানের জল,—চোখ বুজে থাকাটা ভালো দেখায় আর? বুন কিনা, তাই; মেয়ে হলে পারতো?"

ফুলির কানে উঠিলে ফুলি রাগিয়া যায়, ঠোঁট দুইটা কুঁচকাইয়া পাঁচ বাড়ি পর্যন্ত আওয়াজ যায় এরূপ কণ্ঠে বলে,—"ফুলির কথা ভাবতে হবে না, সব নিজের চরকায় তেল দিক্। হেলো চাষার গাঁ, তার আবার মাতব্বর! দাদাকে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা কইতে হবে! গেচি আর কি!"

উত্তর যে না হয় এমন নয়—"চাকরির গুমর ! অতচ চাকরি কি, না, ইঞ্জিনে কয়লা ঠেলা—তা ডাকগাড়িই বা কি আর মালগাড়িই বা কি··· বলে লোকে, চোখে নাগে ব'লে—গাঁয়ের মধ্যেই তো !···বে হচ্ছে না, তা না হয় একটু হায়া করেই থাক্—বলে নোকে কি সাধ করে ?"

সবই কিন্তু নেপথ্যে ; গলা খুলিয়া ফুলির কথার জবাব দেয় এমন বুকের পাটা কাছে-পিঠে কাহারও নাই। ফলে কথা আর বাড়ে না ; এইভাবে চলিতেছে।

এইভাবে উপরে উপরে চলিতেছে বলাই ঠিক, কেন না—ভিতরে ভিতরে আর একটি ঘটনাস্রোত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। খুব যে ভিতরে ভিতরে এমনও নয় ; ছোট গ্রাম, কথাটা প্রায় জানাজানি হইয়া আসিতেছে।

গুমতি-ম্যান বৃন্দাবনের বাড়ি একটা গ্রাম বাদ দিয়াই, ক্রোশ-খানেকেরও পথ নয়। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা, বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স, মাথায় বাবরি,—ভালো করিয়া ছাঁটা, ভালো করিয়া আঁচড়ান। চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু বসিয়া থাকে না ; আসিয়াই পাশের খানিকটা জায়গা কোপাইয়া একটু বাগান করিয়াছে, কঞ্চির বেড়া, ভিতরে দু'তিনরকম আনাজ ; চার দিকে রাঙা-নটে-ডাঁটা ; গুমতির চারকোণে চারটি করবীর ঝাড় বসাইয়াছে, তিন কেয়ারি নয়নতারা, দু'তিনরকম পাতা-বাহার। বাঁশের আগালে দিয়া গুমতির ছাতে একটা মালতীর চারাও তুলিতেছে।

এই এতগুলি ব্যাপার হঠাৎ একদিন ফুলির চোখে পড়িল। সে বড়-নদীর ওপারে মামার বাড়ি গিয়া অসুখে পড়িয়া গিয়াছিল। অসুখটা সারিতে এবং তাহার পর গায়ে একটু গত্তি হইতে প্রায় মাস চারেক

লাগিয়া গেল। যেদিন ফিরিল, চিরকালের অভ্যাস মতো কাঁকালে ঘড়া লইয়া মজাপুকুর হইতে জল আনিতে যাইতেছিল—রেল পারাইয়া যাইতে হয়—গুমতির চেহারা দেখিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কয়েকবার চাহিতে চাহিতে গেল। বেশ লাগিল; অসুখের পরে অত্যন্ত সাধারণ পুরানো জিনিস সবও বড় মিষ্ট লাগিতেছে, ফুল-ফসলের মধ্যে গুমতি-ঘরটি আরও ভালো লাগিল। ভালো লাগার সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতূহলও জাগিল ফুলির মনে। গুমতি-ম্যান যে বদল হইয়াছে এটা এমন কিছু প্রকাণ্ড খবর নয় যে ভাজ তাহাকে বাড়ি আসিতেই শোনাইবে,—মজাপুকুরের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে ফুলির মুখে একটা হাসি ফুটিল,—এতদিন গিয়া বুড়া বয়সে হঠাৎ তারু চাচার এত শখ আসিল কোথা হইতে? বুড়িকে তালাক দিয়া নূতন চাচি কাড়িল নাকি? গল্প প্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বলিত বটে, রেলের চাকরে বলিয়া—তাহার উপর অনেক বেওয়া বিবিদের নজর আছে, দু'একজন জোয়ানও আছে তাহাদের মধ্যে। পুরানো লোক, তায় বুড়া, গাঁয়ের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা প্রসঙ্গে গল্প চলিত; চাচা শেষ পর্য্যন্ত কথায় কাজে এক করিল নাকি? বড় কৌতুক বোধ হইল ফুলির, ঘাটের ভাঙা রাণায় বসিয়া আবল-তাবল কি সব ভাবিল—বোধ হয় বুড়ো তারু আর নূতন চাচির অভিনব জীবন যাত্রার কথা, অনেকবারেই মুখে মিটি-মিটি হাসি ফুটিল ফুলির; তাহার পর এক সময় ঘড়া ভরিয়া বাড়িমুখো হইল; বেলা পড়িয়া আসিতেছে।

গুমতির কাছাকাছি আসিয়া ফুলির মাথায় এক ভূত চাপিল;—বুড়া বয়সে জোয়ান বৌ করিয়াছে চাচা, প্রাণে নূতন শখের জোয়ার আসিয়াছে, ফলেফুলে গুমতিটাকে পর্য্যন্ত স্বর্গপুরী করিয়া তুলিয়াছে—ঠাট্টার এমন সুযোগটা ছাড়িয়া যাইবে ফুলি?—মরিলেও আপশোষ

যাইবে না যে।

গুমতি থেকে ধুঁয়ার কুণ্ডলী বাহির হইতেছে, চাচা এই সময় রান্নার পাট সারিয়া লয়। ফুলি ঘড়া-কাঁখে দুলিতে দুলিতে অগ্রসর হইল। গুমতির মুখের কাছাকাছি আসিয়া বেশ সরস করিয়া হাসিতে হাসিতে আরম্ভ করিল—"বলি হ্যাঁ চাচা, একটু চোখের আড়াল হয়েচি আর ফাঁকি দিয়ে…"

"কে?"—বলিয়া বৃন্দাবন হালকা ধোঁয়ার মধ্যে গুমতির মুখের কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইল।

দুজনে খানিকক্ষণ পাথরের মূর্তির মতো সামনা-সামনি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সম্বিত ফিরিল প্রথমে ফুলিরই; বেশ সহজভাবেই বলিল—"আমি তারু চাচাকে খুঁজছিনু!"

"তিনি তো রিটার করেছে, আজ মাস তিন হোল।"

বৃন্দাবন কি ভাবিয়া ইংরাজী কথাটা বলিল সেই জানে, তবে চাকরি লইয়া এ ধরণের কিছু কিছু কথা ফুলির জানা, ওর বাপও 'রিটার' করিয়া পেনসন লইয়াছিল—অর্থটা বুঝিল। বলিল—"ও। আমায় কেউ বলে নি, তাই…"

বৃন্দাবন বলিল—"ও। না, তিনি তো রিটার করেছে; আমি তাঁর জায়গায় বাহালি হোনু।"

"ও—" বলিয়া ঘুরিয়া আবার দুলিতে দুলিতে ফুলি বাড়িমুখো হইল। গতি উহারই মধ্যে যেন একটুও ত্বরিত।

রেলের গুমতির মতো নীরস জায়গায় যে ফুলের স্বপ্ন দেখে তাহার মনের গঠন যে একটু অন্য ধরণের এ-কথা স্বীকার করিতেই হইবে, এবং তাহার আস্তানার সামনে দিয়া একটি মেয়ে যদি নিত্য ঘড়া লইয়া জল

আনিতে যায় তো তাহার ফুলের আদর যে আরও বাড়িবে তাহাতেও কিছু আশ্চর্য্য হইবার নাই। আদরে যত্নে নয়নতারার গাছগুলি গোলাপী ফুলে বোঝাই হইয়া চাপ বাঁধিয়া উঠিল, গোড়া থেকে নূতন নূতন অঙ্কুর বাহির হইয়া করবীর ঝাড় চারটি হইয়া উঠিল আরও পুষ্ট; কয়েক ঝাড় বেলা আসিয়া উপস্থিত হইল, স্থান পরিবর্ত্তনের কয়েকদিন একটু নির্জীব হইয়া রহিল, তাহার পরই মরা পাতা ঝরিয়া গিয়া আদরে যত্নে হরিৎময় হইয়া উঠিল। মালতী চারাটিও তাড়াহুড়া করিয়া বাড়িয়া উঠিবার তাগিদে বাঁশের আগালেটার অনেকখানি ঢাকিয়া ফেলিল। তরকারীর বাগানটা রহিল, তবে ঝিঙের লতার কোলে কোলে তরুলতার গাঢ় সবুজ ঝির-ঝিরে পাতার গুচ্ছ দোল খাইতে লাগিল, জায়গায় জায়গায় এক আধটা রাঙা টকটকে ফুলও উঁকি মারিতে লাগিল। অবশ্য একদিনে হইল না, তবে প্রতিদিনই কিছু কিছু হইয়া চলিল।

ফুলি জল ভরিতে যায়। প্রায়ই সঙ্গে প্রতিবেশী অন্য কোন মেয়ে থাকে, একজন হোক, দুজন হোক, আরও বেশি হোক; যেদিন থাকে না, ফুলি ভাইপোটিকে সঙ্গে লয়। ছেলেটির নাম কেষ্ট, বয়স বছর আষ্টেক; সে থাকিলেই ফুলির সুবিধা হয় বেশি। গুমতি পার হইয়াই আরম্ভ করে —"তারু চাচা দিব্যিটি ছেল, নারে কেষ্ট?"

কেষ্ট উত্তর দেয়—"হুঁ।"

"আর এ-বাবুর বাগানেরই কি বাহার!…কর কি তুমি বাপু?…না, আমি গেট বন্ধ করে গাড়িকে ফেলাক্ দেখাই! ওরে ব্বাস রে, কত দরের লোকটা! তার একটা ফুল বাগান না হলে চলে?"

মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া কথাটা বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

কেষ্টও হাসিয়া ঘাড় ফিরাইয়া গুমতির পানে চায়; ফুলি সামনের দিকে চাহিয়াই প্রশ্ন করে—"হাসিটে আমার দেখতে পেলে নাকিরে কেষ্ট? চেয়ে আছে কি এদিক পানে?"

কেষ্ট একটু চাপা গলায় বলে—"দেখছেলো, আমি তাকাতে মুখ ফিইরে নিলে। ফেরবার সময় চটে গেট বন্ধ করে দেবে না তো রে পিসি?"

দারুণ অবজ্ঞায় ফুলির ঠোঁট দুইটা কুঁচকাইয়া ওঠে, বলে—"সাধ্যি! ...কার মেয়ে, কার বুন তা মনে রাখে যেন। তোর বাপ কার পাশে দেঁইড়ে কাজ করে একেবার দেখতে বলিস,—আনকোরা বিলিতি সাহেব, টকটকে হাঁড়িপানা মুখ, গুমতি-ম্যান হলে সেলাম ঠুকতে ঠুকতেই হাতে বাত ধরে যেত!...গেট বন্ধ করবে..."

ঠোঁট দুইটা খুব চাপিয়া মাথাটা দুলাইয়া দেয়।

বৃন্দাবনেরও দোষ নাই, কেষ্টারও একটা ছেলেমানুষী আশঙ্কামাত্র, কিন্তু এমন জায়গায় ঘা পড়ে, অনেকক্ষণ পর্যন্তই ফুলির গরগরানি আর যায় না! দুই পুরুষ লইয়া যাহাদের বাড়িতে ডাকগাড়ি হাঁকাইতেছে তাহার সামনে এক ফেলাক-দেখানে গুমতি-ম্যান!

এক একদিন কি খেয়াল হয়, সাজের মধ্যে একটু অভিনবত্ব আমদানি করে ফুলি, রাঙা গামছাটা হাতে না লইয়া শাড়ির আঁচল ঢাকিয়া বুক-পিঠের উপর ফেলিয়া দেয়, শাড়িটাও বোধহয় একটু ভালোই পরে, আর এলো চুলের আগায় একটা গেরো দিয়া সমস্ত চুল সুদ্ধ মাথার ঠিক মাঝখানটিতে বসাইয়া দেয়।

গুমতি পার হইয়া প্রশ্ন করে—"দেখছেলো নাকি রে কেষ্ট, ড্যাবা ড্যাবা চোখ মেলে?"

কেষ্ট চকিতে একবার দেখিয়া লইয়া তখনই মুখটা ঘুরাইয়া লয়, বলে —"দেখছেলই তো, আমি তাকাতে ঝট করে মুখটা ফিইরে নিলে।"

ফুলি একটু চুপ করিয়া থাকে, তাহার পর প্রশ্ন করে—"আজ আমি কেষ্টচুড়োর মতন করে চুলটা মাথে তুলে দিচি কেনে বলতো রে কেষ্টা?"

"কেনে রে পিসি?"

"শুমতিম্যানের মাথায় বাবরির বাহার দেখিস নে?...তুমি লোকটা কে বাপু?—না, আমি চলন্ত গাড়িকে ফেলাক দেখাই!...তাই তো তোকে জিগোলাম—দেখচে কিনা। দেখুক—বাবরি আমার মাথেও আচে—আমিও এই রকম করে দুলিয়ে দুলিয়ে..."

মাথার অল্প একটু দোল দিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে।

৩

ছবির অপর দিকটাও একটু দেখা দরকার।

ডাক গাড়ি দেখার দলটা এখনও আছে। অবশ্য ফুলি থাকে না—আগের তাহারা কেহই আর নাই, এখন তাহাদের ছোট ভাই, বোন, ভাইপো, ভাইঝিরা আসিয়া ফটকে বুক চাপিয়া দাঁড়ায়। কেষ্ট তো নিয়মিত দর্শক—তাহার বাবা ডাক গাড়ি হাঁকাইতেছে, ফটকের মাঝ-খানের জায়গাটি তাহার বাঁধা। ফুলি থাকে না, তবে এক একদিন এমনও হয়, জল তুলিতে যাইতে দেরি হইয়া গেছে, ফিরিতে ফিরিতে দূর থেকেই নজরে পড়ে বৃন্দাবন ফ্ল্যাগটা হাতে গুটাইয়া ধীরে ধীরে

ফটক বন্ধ করিতেছে। ডাক গাড়ি আসিতেছে। কুলি পা চালাইয়া দেয়। আজকাল আর সেরকম সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না, নিজেরও কুণ্ঠা হয়, তা' ভিন্ন গোড়ায় গোড়ায় দু'একবার ধমকও খাইয়াছে ভাইয়ের কাছে। কলসি লইয়া একটু তেরছা হইয়া ঘাড় নিচু করিয়া দাঁড়ায়, এবং সেইভাবেই অল্প একটু চোখ তুলিয়া দাদার ইঞ্জিন দেখিবার সাধ মিটাইয়া লয়। এমন সব দিনে বৃন্দাবন ফ্ল্যাগ দেখান পর্বটা একটু সাড়ম্বরেই সমাধা করে, ফটক খোলাও যে খুব সোজা ব্যাপার নয় এটাও যথাসাধ্য জানাইয়া দিবার চেষ্টা করে।

ডাক গাড়ি চলিয়া গেলে দলটা হৈ হৈ করিতে করিতে মজাপুকুরের মাঠে খেলিতে চলিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় যখন ফেরে, বৃন্দাবন গুমতির বাহিরটিতে থাকে দাঁড়াইয়া। তারুশেখ যেমন ছেলেমেয়েদের আদর দিত, লোকটা সে-ধরণের নয়, আস্কারা দিলেই তো বাগানের উপর নজর পড়িবে। তবে কেষ্টর সঙ্গে এদানি একটু ভাব হইয়াছে। ডাকে— "কেষ্টবাবু নাকি হে ? বাবার সাথে কি আলাপটা হল একটু কইবে না ?"

ওদের পরিবারের খুঁটিনাটি কি করিয়া সব সংগ্রহ করিয়াছে।

সমস্ত দলটা খিল খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে,—একে এতবড় রসিকতা, তায় গুমতিম্যান বৃন্দাবনের মুখ দিয়া বাহির হইতেছে ! ঠেলাঠেলি লাগিয়া যায়—"বল না রে কেষ্টা, বাবা ইঞ্জিন থে' কানে কানে কি কইল।"

আবার হাসি ওঠে। কেষ্ট বলে—"কইল সে অনেক কথা— অনে—ক, অনে—ক..."

ছোটদের হাসি সস্তা, এই ধরণের কথাবার্তাতেই জায়গাটা হাসিতে হাসিতে মুখর হইয়া ওঠে খানিকক্ষণ।

বৃন্দাবন বলে—"তা তুমি একটু বসবেনি ?—বসো না না-হয়, কি

কইলে একটু শুনি। তোমরা যাও হে, আমাদের একটু কানে কানে কথা হবে। আমাদের লাইনের কথা সবাইকে শুনতে নেই...”

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, অর্থাৎ সব পাৎলা হও; তবুও সেইটাকেই আনন্দে পরিণত করিয়া লয় সকলে। “লাইনের কথা—শুনতে নেই—শুনতে নেই—শুনতে নেই” বলিতে বলিতে হুল্লোড়ের আর একটা জের তুলিয়া সবাই লাফাইতে লাফাইতে, হাততালি দিতে দিতে চলিয়া যায়।

গুমতির বাহিরেই একফালি পরিষ্কার ঘাসে-ঢাকা জমি, কেষ্ট বসিতে যায়; বৃন্দাবন বলিয়া ওঠে—“দাঁড়াও হে, দাঁড়াও; চ্যাটাইটা বের করি, তুমি হচ্চ আমাদের অভিরামদার ছাওয়াল, তিনি সায়েবের পাশে দেঁড়িয়ে ডাকগাড়ির ইঞ্জিন হাঁকায় আর তুমি মাটিতে বোসবে? বাঃ, বিচারটা খাসা বটে!”

বসিয়া আরম্ভ করে—“তারপর, অভিরামদা এ ডিবটিতে কোথায় যায়, কোথায় গেছল, তা কিছু গল্প করলে? একদিন গিয়ে যে তানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসব—তা যা গাড়ির হিড়িকি, গেট ছেড়ে নড়বার জো আছে?...তা আমার কথা কিছু জিগ্যেস করছেল নাকি?”

অভিরামের ফুরসৎ আরও কম, অমন ডাগোর বোনটার একটা হিল্লে করিবে সেইটুকুই হইয়া ওঠে না তো বৃন্দাবনের খোঁজ লইবে। গোড়াতেই একবার কবে নেশার ঝোঁকে বাড়ি ঢুকিতে ঢুকিতে বলিয়াছিল—“আজ তারু চাচার জায়গায় গুমতিতে কোন এক নতুন সুমুন্দিকে দেখনু যেন রে!” গালাগালের অংশটা বাদ দিয়া কেষ্ট ঐ কথাটাই একটু ভদ্র করিয়া চালাইয়া দেয়। বৃন্দাবন বলে—“তা জিগোবে না? রেলের-রেলের নোক যে সব এক। যাবো একদিন, ৯ই এবার ৮ বলে যাবে।...দেখো, ভুলেই গেসনু আর কি! মুড়কির

লাড়ু খেতে ভালোবাসোনা ? নারকেলকুর দেওয়া—আজ বুন গাঁ থেকে এসল কিনা, নিয়ে এল। তা মনে করনু আমাদের কেষ্টবাবুর জন্তে গোটাকতক রেখে দিই না হয়।"

তোয়াজের সঙ্গে সঙ্গে আলাপ আরও অন্তরঙ্গ হইয়া আসে।

"মা কেমন আছে ? কোলের বুনটি ? আমাদের আবার লাইনের সব ভাই-ভাই কিনা, অভিদা নাই, একটু খোঁজ রাখতে হয়। নইলে অভিদা ভাববে—দেখো, বিন্দাবন রয়েচে পাশে, লাইনের লোক, অতচ একবার ঘুরেও তাকায় না ..."

কেষ্ট নাড়ুতে কামড় দিয়া বলে—"ভালোই তো আছে।"

"তা বলে তুমি আবার বাড়িতে বোলো না যে বিন্দাবনদা এই সব জিগোচ্ছেল—বৌদি ভাববে—দেখো, লাইনের লোক, এসে একটু খোঁজ নিয়ে যাবে সে মুরোদ নেই, জিগেস করেই দায়ে খালাস !...না, এখানকার কথা উঠ্যে দরকার নাই।...কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ, না, অমুকের বাড়ি ছিলাম—একটা কারুর নাম করে দেবে।...নাড়ুগুনো কেমন ?"

কেষ্ট একটু মাথাটা নাড়িয়া বলে—"খাসা !"

আমাদের মুলুটির নাড়ু কিনা, লামী যে—নোকে বদ্দমানের সীতাভোগ ফেলে খাবে না ?...আর কি যেন বলতে গিয়ে ভুলে গেনু—হ্যাঁ, তোমার পিসি কেমন আছে ? ঐ যে ঘড়া করে জল লিয়ে যায় গো—এক আধ দিন দেখি—পিসিই তো তোমার ? আমার আবার মনেও থাকে না। সবার কথা জিগোলুম, আর একজনকে বাদ দেওয়াটা অধম্ম হয় তো ?—তাই..."

কেষ্ট মাথা নাড়ে, তাহার পর বলে—"ভালোই তো আচে।"

এইবার একটু শক্ত হইয়া পড়ে, এইখানটিতে আসিয়া পড়িবার জন্যই তো এত তোড়জোড় ? বৃন্দাবন বেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকে। কেষ্টর নাড়ু ভক্ষণ শেষ হইলে বলে—"এইবার একটু জল খেতে হবে কেষ্টবাবুর, নয় কি ?—এই দিই।"

ঘরের মধ্যে, চোখের আড়াল হইয়া, একটু সুবিধা হয় ; বৃন্দাবন জল গড়াইতে গড়াইতে বলে—"ভালো কথা মনে পড়ে গেল—কেষ্টবাবুর পিসি আমায় নিয়ে কি যেন বলছেল সেদিন—কোনো মন্দ কথা নাকি গো ?"

কথাটা যে মন্দ, ছেলেমানুষ হলেও কেষ্ট বোঝে, বলে—"না !"

তাহার পর একটু বুদ্ধি খাটাইয়া বলে—"বলছেল কি খাসা বাগান আর কি খাসা ফুল !"

বৃন্দাবন গেলাস হাতে বাহিরে আসিতে আসিতে বলে—"তবে যে হাসলে দুজনে ?—দেখনু যে আমি ?"

কেষ্ট একটু থতমত খাইয়া যায়, খানিকটা কথা ফাঁস করিয়া ফেলে, বলে—"বললে, আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে নাকিরে ? আমি বন্নু—কৈ না-তো।"

বৃন্দাবন একটু চুপ করিয়া কি যেন ভাবে, তাহার পর গেলাসটা ভিতরে রাখিয়া আসিয়া বলে—"এবার এক কাজ করবে—বলবে—দেখ-ছেলই তো।"

কেষ্ট ঠিক বুঝিতে পারে না, মুখের দিকে খানিক চাহিয়া থাকে, তাহার পর বলে—"তাইতো বন্নু,—বলেছিনু উই কথা।"

বৃন্দাবন বিস্ময়ে একটু পিছনে হেলিয়া পড়ে, বলে—"কও কথা ! তুমি বললে তাই ?…আরে ! আমি দেখতে যাব ক্যানে, কি বয়েটা গেছে ? বলে গাড়িকে ফেলাক্ দেখিয়েই ফুরসুৎ নেই…তা হ্যাঁ, বললে

কি পিসি শুনি ?”

“মানা করেচে কইতে।”

“তা করুক না মানা, আমি কি তাকে বলে দিতে যাচ্চি ? দেখ দেখি ! কেষ্টবাবু এত বুদ্ধিমান হয়েও বোকা হেন কথা কয় ! বলবো যে, আমার কি তোমার পিসির সাথে কথা আচে ? আর কইব কখন কথা তাই কও ? চারটে লাইনের গাড়ি সামলাতেই…”

মানা থাকায় বলিবার জন্যই জিভ চুলকায় কেষ্টর, একটু একটু করিয়া সব কথাই ফাঁস করিয়া দেয়, ফটক বন্ধ করিয়া দেওয়ার কথায় পিসির গরগরানি—মায় গুমতিম্যানের সেলাম ঠুকিতে ঠুকিতে হাতে বাত ধরিয়া যাওয়ার কথা পর্যন্ত।

ছেলেটা ওপরে দেখিতে যাই হোক, ভিতরে ভিতরে বেশ চালাক—নিজের দর বাড়াইতে জানে। মানা সত্ত্বেও যেমন ফুলির কথাগুলি বৃন্দাবনের কাছে প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি আবার বৃন্দাবনের কথাগুলিও অবসর বুঝিয়া ফুলির কাছে পৌঁছাইয়া দেয়। শুধু এই প্রকাশ করার কথাটা দুজনের কাহাকেও জানিতে দেয় না,—তাহা হইলে দর আবার পড়িয়া যাইবে তো ?

এই করিয়া চলিল।

৪

রাসের সময়।

গ্রামটা বোষ্টমদের। প্রায় সবাই গরীব চাষী; তবু এই সময়টা একটু সাড়া পড়িয়া যায়।

পুকুরে গা ধুইয়া ঘড়া করিয়া জল লইয়া ফুলি বাড়ি ফিরিল; ভিতরে ভিতরে কি একটা কথা যেন ভাবিতেছে; মুখে অল্প একটু হাসি লাগিয়া আছে।

বড় ঘরের দাওয়া থেকে ভাজ একটু ঠোঁট চাপিয়া প্রশ্ন করিল—"পুকুরঘাট থেকে ঠাকুরঝি আজ হাসি ঠোঁটে করে ফিরল কেনে গো?—শুনতে নেই গরীবদের?"

রান্না ঘরের দাওয়ার সিঁড়িতে এক ধাপ উঠিয়া ফুলি ঘড়া কাঁধেই ঘুরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—"অবিশ্যি হাসির কথা নয়, কিন্তু কী ফুলের ছিষ্টি গো বৌদি যদি দেখ! যেমনি নয়নতারা, তেমনি কি করুবী আর মল্লিকে!—গাছ যেন বলে আমি ভেঙে পড়ব! আর মালতীর নতাটা তো শাদা হয়ে রয়েচে! মুয়ে আগুন, সাধ করে কি বলি হাসির কথা নয়,—গোঁসাইয়ের রাস, ফুলগুনো তুলে দে গৌরাঙ্গতলায় পাঠিয়ে, একটা সাখোক হবে, না, বাগান সাজিয়ে আমি বসে আছি—কিস্কিন্দের রাজা!..."

খালি হাতটা সঞ্চালিত করিয়া, সমস্ত শরীরটাতেও একটা দোলা দিয়া ফুলি নাক সিটকাইয়া আর এক ধাপে একটা পা তুলিয়া দিয়া তখনই সেটা নামাইয়া বলিল—"রাজার রাজপেসাদ কি? না, ছটাক খানেকের একটা গুমতি! মনের এমন মতি-গতি না হলে রেল কোম্পানী

আর ফেলাক্-দেখানে গুমতিম্যান করে রেখেছে কেনে?···ভালো কাজ কি ছেল না?···কি ফুল গো বৌদি—ফুলের যেন মোচ্ছোব পড়ে গেছে! চোখ ফেরাতে কি পারা যায়?"

"না হয় দুটি চেয়েই আনতে গো।"

গম্ভীর হইয়াই বলে ভাজ; তবু ঠোঁটের একটি কোণ যেন রহস্যে একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

ঘড়া রাখিয়া নামিতে নামিতে ফুলি আবার সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িল। দেমাকে ঘাড়টি যেমন গিয়াছে বাঁকিয়া, অবজ্ঞায় তেমনি নাক আর ঠোঁট দুইটি একত্রে জড়ো হইয়া উঠিয়াছে, কথায় একটু টান দিয়া বলিল—"রসো গো ধনি, ঢের হয়েছে, ক্ষ্যামা দাও! অর্জুন বোষ্টমের মেয়ে ফুলি যাবে ফুল চাইতে—একটা গুমতি-ম্যানের কাছে!···হাত পেতে চাইতে!···কার বেটি, কার বুন—একবার ভেবে কথা কয়ো!··· যে ইঞ্জিনটাকে হাঁকায় দাদা সেটা পজ্জন্ত ফিরে তাকায় না, রাঙা ফেলাক্ হাতে করে ধিনিকেষ্ট হয়ে দেঁইড়ে আচে—কি সবজে ফেলাক্।···হাত পেতে যাবে ফুল চাইতে!"

একটু থামিয়া তর্জনী চালিত করিয়া বলিল—"এর সাজা কি জানো? আচে এক সাজা। ওর নাকের নিচে থেকে সমস্ত ফুল একটি একটি করে তুলে আনা যায়—লুটে-পুটে—ওকে গুমতির মধ্যি ছেকল দিয়ে রেখে···"

কেষ্ট দাওয়ার একপাশে বসিয়া একটা কাঁসিতে করিয়া নূতন গুড় মাখিয়া মুড়ি খাইতেছিল, হঠাৎ দুই তিন মুঠা তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া দাওয়া থেকে লাফাইয়া পড়িল এবং কিছু না বলিয়াই দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। ঐ রকম ওর; বেশ আছে, বেশ আছে,

হঠাৎ মাথায় কি ঢোকে, এক কাজ ফেলিয়া আর এক কাজে ঝাঁপাইয়া পড়ে। মা গলা তুলিয়া বলিল—"শীগগির এসবি কেষ্ট, সন্দের পরেই গোঁসাইতলায় যাবো—খাওয়া দাওয়া সেরে…"

ফুলি গরগর করিতে করিতে ভিজা কাপড়টা ছাড়িল, তাহার পর উঠানে টগর গাছ থেকে ফুল কটা তুলিয়া আনিয়া একটা মালা গাঁথিতে বসিয়া গেল। গাছটা এবারে ফুল দিতেছে অল্প, তাই লইয়াই ফুলির গরগরানি গেল বাড়িয়া—"এসব গাছে ফুল দেবে কেনে? এতে যে গোঁসাইয়ের পূজো হবে—যত ফুল গিয়ে ফুটবে গুমতিম্যানের বাগানে, না দেবায় ন ধম্মায়…তা ভাগ্যি চাই তো আবার; গোঁসাইয়ের ছিচরণে স্থটুবে, কি গলায় উঠবে, তার ভাগ্যি চাই না?…"

ভাজ পাশের দড়ির দোলনাটাতে একটা মাদুর পাতিয়া খুকিকে শোয়াইয়া দিয়া গেল, বলিল—"আমি এই খিড়কির পুকুর থেকেই গা ধুয়ে এনু বলে ঠাকুরঝি, ত্যাতক্ষণে আকাটাও ধরে উঠবে।…কাঁদে, একটু দোল দিয়ে দিও। একটা আমার জন্যে মালা…কুলুবে না ফুলে? তা আমার হাতের মালা—গোঁসাইয়ের তেমন ভাগ্যি হবে তবে তো!"

একটু মাথা দুলাইয়া, চোখ ঘুরাইয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

মালাটা প্রায় অর্ধেক গাঁথা হইয়াছে, কেষ্ট আসিয়া হাজির হইল। মুখটা উজ্জ্বল, "কোঁচড়ে কি আচে বল তো পিসি?"—বলিতে বলিতে আসিয়া সমস্ত কোঁচড়টা উজাড় করিয়া একরাশ ফুল দাওয়ার উপর ঢালিয়া দিল—করবী, নয়নতারা, বেলা, মালতী; টকটকে লাল,—মাঝখানে হলদের টিপ দেওয়া তরুলতার ফুল—একটি রাশ! দাওয়াটা যেন হঠাৎ আলো করিয়া দিল, গন্ধে হাওয়াটা বোঝাই হইয়া উঠিল।

ফুলি পুলকে, বিস্ময়ে ভাইপোর দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন করিল—

"কুথায় পেলি রে!"

"বল্ না।"

"দিলে তুলতে?"

"নিজে ও তুলে দিলে!"

ফুলি যেন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে। কি ভাবিয়া একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর দুই হাতে আলগাভাবে রাশিখানেক ফুল তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ছাড়িয়া দিতে দিতে বলিল—"কী চমৎকার রে কেষ্ট—আর কত! নিজে তুলে দিলে?...লোকটা খুব যে মন্দ তা নয়, তবে..."

হঠাৎ মিনতির স্বরে একটু ত্রস্তভাবে বলিল—"তুই এক কাজ কর কেষ্ট, শীগগির পেতে থেকে খানিকটা সুতো আর একটা ছুঁচ নিয়ে আয়—লক্ষ্মী ধন আমার, টপটপ করে গোটাকতক মালা গেঁথে ফেলি দুজনে—বৌদির দুটো, আমার দু'টো, আজ তো দাদাও এসবে—তার দুটো, তোর...গোঁসাই কেমন পাইয়ে দিলেন দেখ্ না। নোকটা ভালো, তবে...তুই বুঝি গোঁসাইয়ের নাম করে বললি?"

"হুঁ।"

"কি বললে?"

"গুড়ুক খাচ্ছেল, বললে—গোঁসাইয়ের জন্যে তো ক'বাড়িথে' নিয়ে গেল; তা নাও, হরেক গাছ থেকে দু'পাঁচটা করে তুলে! কটাই বা আচে ফুল আর?...তুলচি, গুড়ুক খেতে খেতে জিগোলে—পাঠালে কে তোমারে?...বল্লু—পিসি পাট্যেচে।...পিসি পাট্যেচে? তখনি হুঁকো রেখে নিজে এসে তুলতে লাগল, বললে—তুমি সরে দাঁড়াও তো, তোমার কম্ম নয়, কুঁড়ি তুলবে কি, কি তুলবে। পিসি পাট্যেচে, তা আগে বলতে হয়, তা হলে..."

পিসির মুখের উপর নজর পড়িতে কেষ্ট হঠাৎ থামিয়া গেল, মুখটা অন্ধকার হইয়া গেছে, ফুল লইয়া আলগাভাবে নাড়াচাড়া করিতেছিল, হাতটা বন্ধ হইয়া গেছে। আড় চোখে দ্বিতীয়বার চাহিয়া লইয়া কেষ্ট বলিল—"দাঁড়াও, আমি ছুঁচ সুতোটা লিয়ে এসি।"

দেরি করিতে লাগিল, সামনে আসিতে সাহস হইতেছে না। সবটা বোঝে না, তবে এটা আন্দাজ করিতে পারে যে দুজনের মধ্যে কিছু একটা ব্যাপার আছে যার জন্য পিসির মেজাজ সব সময় ঠিক থাকে না। তাগাদা খাইয়া যখন বাহির হইল, চৌকাঠের নিকট হইতেই দেখিল পিসির হাত দু'টা আবার ফুল লইয়া মাখামাখি করিতেছে; মুখেরও সে ভাব আর নাই, সে কাছে আসিতে ভ্রূ তুলিয়া মাথাটা একটু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—"তবেই বোঝ কেষ্ট, তোরা মনে করিস পিসিটা কে তো কে—গেরাহ্যির মধ্যে আনিস না। ঐ দেখ, যেই নামটা শুনেচে কি ছুট্যে গেছে ফুল দিতে—রাণীর খাতিরটা একবার দেখে থোস্—রাণী ফুলেশ্বরী দাসী।..."

মালা গাঁথার হাতটা বন্ধ রাখিয়া মাথা দুলাইয়া বলিতে বলিতে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। খুকিটা কাঁদিবার উপক্রম করিতেছিল, দোলনায় একটা ঠেলা দিয়া বলিয়া উঠিল—"চুপ কর ছুঁড়ি, কান্না শুনলে এক্ষুনি মাথা ধরবে রাণীর!"

আরও জোরে হাসিয়া উঠিল, কেষ্টও যোগ দিয়া বাঁচিল।

৫

কথাটা লইয়া গোঁসাইতলায় একটু ফিসফিসানি উঠিল। ফুলে অভিরামের বাড়িই সবকে টেক্কা দিল। তাও পাঁচ জায়গার ফুল নয়।...কেষ্ট আবার মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল—"হিঁ, বিন্দাবনদা নিজের হাতে দিলে তুলে! ভাবো কি?"

পিসির নামটা কি ভাবিয়া আর করিল না।

একটু বাঁকা হাসি উঠিল অনেকের ঠোঁটে।

অভিরামের বৌকে শুনিতেও হইল একটু, অবশ্য একটু আড়ে; রাসের আসরে বোষ্টমদের মুখ একটু যায়ই খুলিয়া, কটু বোধ হয় না।

"আমাদের খোকাকে পাট্যেছিনু, তা একমুঠোও দেয় নি ফুল।"

ইঙ্গিতটা বুঝিয়াও অভিরামের বৌ গায়ে মাখিল না, বরং, ননদ লইয়া রসিকতা, আর একটু স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য বলিল—'আমাদেরও তো খোকাই আনতে গেছল।"

"তা পাট্যেছেল কে সেটা আবার দেখতে হবে তো—ফুলেশ্বরীর দূত!..."

অভিরামর বৌ হাসিয়া বলিল—"তা একটু নজরের তফাৎ হবে নি ভাই মানুষটোর—অমন খাসা বাগানটা যে করতে পারে! তোমার আমার হুকুমে যা দেবে ঠাকুরঝির হুকুমেও তাই কথনও দিতে পারে? পছন্দ বলে জিনিস আছে তো মানুষটির?"

পাঁচজনের মধ্যে কথা; একচোট হাসি পড়ে। তাহার পর ভেতরের কথাটাই বলে অভিরামের বৌ।

"পালটা ধর যে, খোঁজ নিয়েচি কিনা; হয় তো খুব খাসাই হয়।

তাই একটু থাকি চোখ ফিরিয়ে। তা যা মেয়ে, ভুলতে দেবে একটু কথাটা ?···কিনা, ভাই আমার ডাকগাড়ির ইঞ্জিন হাঁকায়, আমার কাছে শুমতিম্যানের কথা !···এদিকে ভাই যখন ঝুলকালি মেখে ঘরে সেঁদোয় দেখে তো অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এসে···”

আবার বেশ হাসি ওঠে।

ফুলি আছে সাজানো লইয়া। গাঁয়ের মেয়ে, তায় বয়স হইয়াছে, তায় একটু বেপরোয়া গোছেরও,—ওই সব ঝিউড়িদের পাণ্ডা, সাজানো গোছানোর ব্যাপারে সব ঠাঁয়েই অগ্রণী। আজ আবার যেন মাতিয়া গেছে।

মাতিয়া যাওয়াটা দরকার হইয়া পড়িয়াছে ফুলির। ওর ভিতরে ভিতরে যেন একটা ঝড় বহিতেছে, এক মুহূর্ত মনটাকে এদিক থেকে ছাড়িয়া দিলে সেটা যেন সেই ঝড়ের ঘূর্ণিতে পড়িয়া ওলটপালট খাইয়া যাইতেছে। ব্যাপারটা যে ঠিক কবে থেকে আরম্ভ হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছে না, তবে স্পষ্ট হইয়াছে আজ কেষ্টর ফুল আনার পর থেকে। তাও এমন স্পষ্টই বা কি ? এক একবার মনে হইতেছে একটা চাপা অপমানে ভিতরটা তচনচ করিয়া দিতেছে ; কিন্তু আবার সব যেন যাইতেছে উলটাইয়া—ঐ অপমানই যেন লাগিতেছে মিষ্ট,—কেবলই ভাবিতে ইচ্ছা করিতেছে—কেষ্ট এক কোঁচড় ফুল আনিয়া হাজির—আগে বৃন্দাবন গা করে নাই, তাহার পর যেই শুনিল ফুলি পাঠাইয়াছে—যেই নাম হলো না ফুলির, নিজে হুঁকা ছাড়িয়া—ফুলে ফুলে কেষ্টর কোঁচড় ভরিয়া দিল।···যায় না এ চিন্তাটা,—রাগে অপমানে মনটা যখন উত্তপ্ত হইয়া থাকে তখনই যেন থাকে ভালো, তবু সব ঠেলিয়া এই চিন্তাটাই যেন ঘাড়ে আসিয়া পড়িতেছে। শুধু তো আর তাই নয়, এই চিন্তাকে কেন্দ্র

করিয়া আরও সব কত রকম চিন্তা, মামার বাড়ি থেকে আসা পর্যন্ত ঐ গুমতিটাকে কেন্দ্র করিয়া যত কিছু হইয়াছে—হঠাৎ সেই ভুল করিয়া গুমতির সামনে চলিয়া যাওয়া, মাথায় চূড়া তুলিয়া পুকুর ঘাটে যাওয়া—কেষ্ট বলিতেছে—'হাঁ দেখেছেই তো, আমি তাকাতে ঝট্ করে চোখটা ফিইয়ে নিলে'...আরও কত সব ব্যাপার, ছোট-খাট, কিন্তু আজ বড় হইয়া দেখা দিতেছে।

যষ্টি-মধুর মত এ মিষ্টি অসহ্য বোধ হইতেছে ফুলির, সাজানোর মধ্যে মনটা ডুবাইয়া রাখিতেছে, যখন নেহাৎ পারিতেছে না, অপমানের অনুভূতিটাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে।...একটা গুমতি-ম্যান—দাদার ইঞ্জিনটাও যার দিকে দৃকপাত করে না, তাহার স্পর্ধা!...

সঙ্গিনীদের মধ্যে আন্না একটু বেশি ঠোঁটকাটা, বাঁকা ইঙ্গিত করিল—"দিলে এতগুনো ফুল লা ফুলি,—একটি ফুলে যে নোকটা হাত দিতে দেয় না!"

দারুণ অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ফুলি বলিতেছে—টানিয়া টানিয়া, মুখটা একটু দুলাইয়া দুলাইয়া—"দেবেনা!—রেলের জমিতে ফুল, তার ওপর আবার দাদা রয়েছে এই গাঁয়েই, না দিয়ে যেন গতি আচে!"

আবার সাজাইতেছে—ফুলের মুকুট, ফুলের কুণ্ডল, ফুলের বাজুবন্ধ। ওদিকে বেটাছেলেরা যাত্রার আসর সাজাইতেছে, সমস্ত জায়গাটা ক্রমেই যেন গমগম করিয়া উঠিতেছে।

দুই দিককার সাজানোই শেষ হইল, এইবার যাত্রা বসিবে, ফুলি গিয়া ভাজকে বলিল—"আমি চনুনু গো বৌদি।"

"কেনে গো, যাত্রা দেখবে নি?"

আরও সবাই প্রশ্ন করিল—

"কেনে গো, এত সাজালি গোজালি আমোদ করে !..."

ফুলের আজ হাট বসালে, আর নিজেই..."

ফুলির কান্না ঠেলিয়া আসিতেছে, আর যদি দুটো মুখে এইরকম দরদের কথা শোনে তো নিজেকে সামলাইতে পারিবে না। তাড়াতাড়ি বলিল—"না, মাথাটা কামড়ে উঠল যে, আচমকা।"

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ভাজ ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—"দাদাকে ভালো করে জাগ্যে নিও, মড়ার মতন পড়ে আচে।"

ফুলি ঘরে আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না, বিছানায় উবুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—অপমান, লজ্জা, এসব তো তবু সওয়া যায়, এরও অতিরিক্ত আর একটা কি—স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় না, যেন যষ্টি-মধুর মতন গলাটা দেয় মাতাইয়া—সেইটাই হইয়াছে অসহ্য।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া কোন্ এক সময় ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সমস্ত দিনটাই ফুলির মুখটা থমথমে হইয়া রহিল, দু'একটা সামান্য কথাতেই যে ভাবে উত্তর দিল, কেহ আর ঘাঁটাইতে সাহস করিল না। একরকম নিঃশব্দেই কাটিল।

সন্ধ্যার সময় ঘড়াটা লইয়া পুকুরের দিকে যাইবে,সামনে কেষ্টার সঙ্গে দেখা। কোঁচড়ে কালকের মতন এক কোঁচড় ফুল। উৎফুল্লভাবে বলিল —"বৃন্দাবনদা" আজকেও দিলে। বললে—রাশের জন্যে..."

ফুলি অল্প একটু ঘাড় বাঁকাইয়া একবার শুধু দেখিয়া লইল, না কোন মন্তব্য করিল, না কিছু জিজ্ঞাসা করিল। দু'পা অগ্রসর হইলে কেষ্টই প্রশ্ন করিল—"এসবো তোর সাথে পিসি, ফুলগুলো থুয়ে ?"

ফুলি চৌকাঠের নিচে দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া প্রশ্ন করিল—"কেনে ?

পাহারা দিতে ?"

মূর্তি দেখিয়া আর কিছু না বলিয়া কেষ্ট ধীরে ধীরে গিয়া দাওয়ায় উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিসির গলার আওয়াজ কানে আসিল—"কেষ্টা!" তাড়াতাড়ি গিয়া দাঁড়াইতে ফুলি প্রশ্ন করিল—"গুমতিম্যানটা আছে ওখানে ?"

কেষ্ট একটু থতমত খাইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল—"হিঁ, ছেল' তো, আমি তারপর আবার আশেদের বাগানে গেনু কিনা।… ছেল' তো।"

অবজ্ঞায় ঠোঁটে পিষিয়া 'গুমতিম্যান' কথাটুকু ব্যবহার করাই ছিল উদ্দেশ্য ফুলির ; কেষ্টর সব কথা একরকম না শুনিয়াই হন হন করিয়া চলিয়া গেল।

পুকুরে যাইবার জন্য কাহাকেও ডাকিল না, শুধু তাহাই নয়, পথে আন্না তাহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলে উত্তর করিল, তাহার এক মুহূর্ত ফুরসৎ নাই। আরও পা চালাইয়া দিল ; আগাইয়া গেলে আন্না ফিরিয়া দেখিয়া ঠোঁট দুইটা কুঞ্চিত করিয়া একটু মাথাটা দুলাইয়া দিল।

ফুলি আজ একেবারে চরম করিবে, মুখোমুখি হইয়া বৃন্দাবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবে—ফুল দেওয়ার ঘটা কেন ? কি ভাবটা তাহার ? কি মনে করে ফুলিকে ?…গলার চোটে সমস্ত গ্রাম একত্র করিবে—ফিস-ফিসানির ধার ধারে না ফুলি। সে অর্জ্জুন বৈরাগীর মেয়ে, অভিরাম বৈরাগীর বোন, গুমতিম্যানের আস্পদ্দাটা ভাঙিবে আজ লোক ডাকিয়া! চাপা হাসির ধার ধারে না।

গুমতির ঘুলঘুলি দিয়া ধুঁয়া বাহির হইতেছে। লেবেল ক্রসিংয়ের

চড়াইয়ের উপর উঠিতে উঠিতে ফুলি দেখিতে পাইল বৃন্দাবন উনান ধরাইতেছে, আর অন্ধকারে তাহাব পিঠের দিকটা দেখা যাইতেছে। ঝগড়ার মুখপাতের কথাটা বারুদের মতো মনে ঠাসিয়া লইয়া ফুলি রেল চারজোড়া পার হইয়া একেবারে গুমতির মুখে গিয়া দাঁড়াইল। মুখ খুলিবে, দেখে এক পাশটিতে নিজের হাঁটু দুইটি জড়াইয়া তাহার দাদা অভিরাম।

একটু নেশার ভাব যেমন সর্বদাই থাকে সেই রকম রহিয়াছে। প্রশ্ন করিল—"কি রে ফুলি,—তুই যে!"

বৃন্দাবন উনান থেকে ফিরিয়া একেবারে হকচকিয়ে গেল। অতিরিক্ত রাগের মাথায় একেবারেই অপ্রত্যাশিত ভাবে দাদাকে দেখিয়া ফুলি বেশ কিরকম হইয়া গেছে বটে, তবে তখনও তাহার বুকটা ওঠা নামা করিতেছে। বৃন্দাবনের দিকে দৃকপাত করিল না, তবে দাদার কথায় আরও একটু থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল বটে ; তাহার পরেই শান্ত অথচ একটু চড়া গলায় বলিল—"হ্যাঁ, এনু, তোমায় ডাকতে।"

"আমায় ?...."

"হ্যাঁ, কেষ্টা বললে তুমি এখানে, তাই...."

—মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, চোখ দুইটার ভিতর যেন আলো জ্বলিতেছে!

"তা হঠাৎ ডাকতে কেনে ?"

ফুলি আবার একটু চুপ করিল, মুখটা আরও যেন রাঙা, তাহার পরই একেবারে ফাটিয়া পড়িল—"কেনে তা জিগোতে তোমার একটু লজ্জা করল নি ? তুমি কার ছেলে তা মনে আচে তোমার ?...অর্জুন বৈরাগীর ছেলে হয়ে নেশা করে একটা গুমতি-ম্যানের সঙ্গে তার ঘরে

বসে থাকতে লজ্জা হোল নি তোমার ? বাবার কথাটা ছাড়ান দাও—তিনি পরিত্রাণ পেয়েছে—আপোদ গেচে—নিজের কথাটাই ভাবো একবারটি, তুমি লোকটা কে ? আর কি নোকের সঙ্গে একাসনে বসে আচো—তোমায় ধিক, তোমার বংশে ধিক—আবার জিগোচ্চ—ফুলি কি করতে এলি ! ফুলির গায়ে আগুন ধরে না গেলে পারত আসতে এ হেন স্থানে ? ফুলি অর্জুন বৈরাগীর বেটি, তার বাবার ইঞ্জিনটা পজ্জন্ত যেদিকে একবার চোখ উলটে তাকায় নি কখন—পায়ের ধুলো ঝাড়তেও কখনও ফুলি এসত নি সেখানে—তা হাজার ফুল পাতা দিয়ে সগ্‌গভূমি করে রাখুক গে না কেনে…এনু গায়ের জ্বালায়—আগুন ধরিয়ে দিয়েচে গায়ে—তাই এনু…”

ঘড়াটা কখন নামাইয়া রাখিয়াছে, দুই কোমরে হাত দিয়া মাথায় এক একটা ঝাঁকানি দিয়া ফুলি একদমে সমস্তটা বলিয়া গিয়া আবার ঘড়াটা হঠাৎ তুলিয়া লইল, যাইবার জন্ত ঘুরিয়া আবার তখনই ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—‘বলি এসবে, না, গুমতির ধোঁয়া বড্ড মিষ্টি লাগছে ? তা হলে এসো নি—ও মুখ আর দেখিও নি পাড়ায়…”

বলিয়া আবার ঘুরিয়া হন-হন করিয়া একেবারে বাড়িমুখো হইল। গা ধোওয়া রহিল পড়িয়া।

৭

অভিরামের গুমতিতে আসিয়া বসার একটু ইতিহাস আছে। একদিন বাড়িতে আসিয়া যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—“আজ তারুশেখের জায়গায়

গুমতিতে লোতুন কোন স্থমুন্দিকে দেখলাম?”—সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহার প্রায় মাস পাঁচেক পরে, অর্থাৎ ফুলির মামার বাড়ি থেকে ফিরবার পর একদিন সন্ধ্যার সময় ডিউটি থেকে ফিরিতেছে, গুমতির সামনে আসিতেই বৃন্দাবন যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল—“পাতঃপেন্নাম হই দাদা।”

স্টেশনে নামিয়াই একটু নেশা করিয়া লয় অভিরাম, দাঁড়াইয়া পড়িয়া জড়িত কণ্ঠে বলিলাম—“চেনলাম না তো।”

বৃন্দাবন বলিল—“গুমতির চাকরি নিয়ে এলাম, মাস পাঁচেক হোল। তা কতবার ভাবি অভিরামদাকে একবার পেন্নাম করে আসি—প্রায় তো দেখছি ডাক গাড়ি হাঁকাতে হাঁকাতে বেরিয়ে গেলেন—সহজ তো লয়—সায়েবের পাশে দেঁইড়ে ডাক গাড়ি হাঁকান…”

নেশায় ব্যাঘাত হইতেছিল! অভিরাম একটু বিরক্তভাবে বলিল—“বাদ দেও তোমার ডাকগাড়ি—কথাটা কি তাই কও।”

“তাই ভাবনু, ফিরতেই না হয় ধরি দাদাকে। যাওয়ার তো উপায় নাই, তা বাড়ি যাওয়ার পথে যদি পায়ের ধুলো পড়ে একটু গুমতিতে…”

সেই হইল গোড়া পত্তন। অভিরাম লোকটা ঢিলাঢালা, তা ভিন্ন ডাকগাড়ি হাঁকায় বলিয়া যে বোনের মতো কোন আভিজাত্য-বোধ আছে এমনও নয়। প্রথমত কয়লা জোগান আর হাঁকানোর প্রভেদটা হাড়ে হাড়েই বোঝে, দ্বিতীয়ত এই ডাকগাড়ি চড়িয়াই পাঁচটা দেশ ঘোরে, সুতরাং বোনের মতো ধরাটাকে নিতান্ত সরা বলিয়া মনে হওয়া সম্ভব নয় তাহার।… প্রতিবারেই নয়, তবে মেজাজটা যদি অনুকূল রহিল, গুমতির মধ্যে বসিয়া বৃন্দাবনের সঙ্গে খানিকটা আলাপ করিয়া যায়। দুজনেই রেলে চাকর—রেলের সুখ দুঃখ লইয়া কথাবার্তা জমে ভালো। এক-

ধরণের হৃদ্যতা জন্মিল।

কথাটা কিন্তু অপ্রকাশ ছিল। বৃন্দাবনের দুই দিক দিয়াই ভয় ছিল—ফুলি যেমন মেয়ে সে যদি টের পায় তো সে ভাইকে সাধ্যমত নিরোধ করিবার চেষ্টা করিবে; তা ভিন্ন ভাইয়ের সংসর্গ পাইয়াছে জানিলে বৃন্দাবনও নেশাখোর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে তাহার কাছে,—আভিজাত্য ডিঙাইবার যেটুকুও বা আশা আছে এখনও, আর থাকিবে না। বলিল—"একটু এসে পায়ের ধুলো দাও ন'মাসে ছ'মাসে—তা এটুকু আর কাউকে জানিয়ে কাজ নেই দাদা।"

অভিরাম বলিল—"দরকার কি ভাই? ভাববে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে নেশার আড্ডা করেছে। পিরথিমিটা ভাল জায়গায় নয় তো।"

অভিরাম রাত করিয়াই আসে, গুমতিটাও গ্রাম থেকে একটু দূরেই, ফাঁকা জায়গায়, ব্যাপারটা কাহারও নজরে পড়ে নাই। বা যদি পড়িয়াও থাকে এক আধ জনের নজরে—তো এটা এমন কিছু রটাইবার কথা মনে করে নাই।

যখন হৃদ্যতাটা বাড়িল আরও, বৃন্দাবন একদিন নানারকম দুঃখের কথা তুলিয়া ঘরের বায়ুমণ্ডলটা করুণ করিয়া তুলিয়া আসল কথাটা পাড়িল—আর এরকম হাত পোড়াইয়া রাঁধিয়া খাওয়া চলে না; কিছু টাকা জমিয়াছে, বিবাহ করিয়া এই গ্রামেই একটু জমি কিনিয়া স্থিতু হইতে চায়—হাতে কোন ভালো পাত্রী আছে অভিরামদার? একটু ডাগোর ডোগোর হলেই ভালো হয়…এটা বোষ্টমদের গ্রাম, সে নিজেও বোষ্টম, তাই জিজ্ঞাসা করা…আছে এমন কোন মেয়ে?

অভিরাম অনেকক্ষণ মাথার চুল টানিয়াও মনে করিতে পারিল না এমন পাত্রী আছে কিনা। বলিল—কেষ্টর মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া

দেখিবে, এসব খোঁজ মেয়েছেলেরাই রাখে কিনা…তাহা হইলে তো এখানে আসার কথাটাও তাহাকে বলিতে হয়…

যে সম্বন্ধটার ব্যবস্থা করিতেছে, সেই সম্বন্ধ ধরিয়াই অভিরামকে মনে মনে একটা গালাগাল দিয়া বৃন্দাবন বলিল—"তাহলে তানাকেই জিগ্গও। তা না-হয় এখানে আসার কথা জানলেই তিনি, গুরুজন তো।"

পরদিন সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। সন্ধ্যার পর গুমতিতে আসিয়া অভিরাম বলিল—"পাওয়া গেছে, মাঝে পড়ে বৌয়ের কাছে বকুনি নেকা ছিল কপালে।…ফুলিকে চেন?"

বৃন্দাবন হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল—"ফুলিটা কে?"

"আমার বুন। ভালো নামও আচে,—ফুলেশ্বরী। পেরাই তো এখান দিয়ে জল আনতে যায়, দেখনি?…তুমিও দেখচি তালকানা আমারই মতন!"

বৃন্দাবন ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মনে করিবার চেষ্টা করিল, বলিল—"ঠাওর করিনি।"

"এবার দেখো—তবে ফুলিকে ঠাওর করে দেখতে হয় না—চুল আচে, রং আচে, গড়ন-পিটন—কপালে তিনটে উলকি—ঠাওর করে দেখতে হবে নি—আপন বুন বলেই বলচি না—আর বয়েস—যেমনটি খুঁজচ; —চলবে?"

নেশাখোর বেকার লোক বলে একটা বদনাম আছে, তাহার উপর কাল বোনের কথা মনে না পড়ায় ধমকও খাইয়াছে বধূর নিকট, অভিরাম বোনকে যতদূর সম্ভব লোভনীয় করিয়া ঘটকালি শুরু করিয়া দিল।

বৃন্দাবন বলিল—"তা তুমি যেমন বলছ—মন্দ কি? আর ঘরে ঘরেই হয়ও…"

সেই সূত্রপাত, তাহার পর কথাবার্তা চলিতেছে, কেষ্টর যাও-আছে। খোঁজ খবর লওয়াও চলিতেছে ভিতরে ভিতরে। কিন্তু মুশকিল হইতেছে ফুলিকে লইয়া। কেষ্টকে মাঝে রাখিয়া বৃন্দাবন যতটুকু খবর পাইতেছে তাহাতে তো উৎসাহের কিছু পাওয়া যায় না। ভাজ দু'একবার আড়ে আবডালে তুলিয়াছে কথাটা ফুলির কাছে, কিন্তু সেই ডাকগাড়ি হাঁকানর বড়াই।...

অভিরাম আসিয়া বৃন্দাবনকে প্রশ্ন করে—"কিছু পাচ্ছ সাড়াটাড়া ?"

বৃন্দাবন ঠোঁট-নাক একত্র করিয়া মাথা নাড়ে।

বৃন্দাবন বেশ একটু বেজার হইয়া বলে—"তোমার কম্ম নয়, মেয়েছেলে হোল—কিযে বলে—মেয়েছেলেই, তাকে বশ করা তোমার কম্ম নয়, গাড়িকে ফেলাক দেখাতে দেখাতেই গিয়ে চিতেয় উঠবে।"

নানারকম পরামর্শ দেয়। এই তো রাশ আসিতেছে, ফুল দিক, ফুলি ভালবাসে ফুল। বাগান কি পরকালে কাজ দিবে ? আর অত কেষ্টর ভরসায় না থাকিয়া নিজেই একটু সাক্ষাৎ কথা কহিবার চেষ্টা করুক না—নিজেরই স্ত্রী তো এক রকম বলতে গেলে—বুকের পাটা চাই একটু, নৈলে হয় এসব কাজ ?"

এই করিয়া চলিতেছিল, এমন সময় নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই শুমতির ঐ ঘটনাটি ঘটিল ; যত চক্রান্ত, যত মতলব ফুলি এক দাবড়ানিতে ভস্ম করিয়া দিল।

ফুলি চলিয়া গেলে দুজনেই খানিকক্ষণ থ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর বৃন্দাবন বলিল—"শুনলে তো ?"

অভিরাম একটু আড়ে চোখ তুলিয়া চাহিল, বলিল—"এক ছিলিম সাজো আরও, হাঁপ ধরিয়ে দিয়েচে। কি কুক্ষণে যে বাবা ডাকগাড়ির ইঞ্জিনের কয়লা দেওয়া হাতাটা নেছলো হাতে তুলে!"

অনেকক্ষণ দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তাহার পর অনেক রাত্রি ধরিয়া পরামর্শ করিল। শেষ কালে অভিরামই একটা মতলব বাহির করিল। এমন লাগান সই মতলব আর হয় না।

যাইবার সময় খুব হাসিল দুইজনে। অভিরাম কয়েক পা গিয়া রেলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একটু টলিতে টলিতে ঘুরিয়া বলিল—"ফুলি! সে আমার সাথে টেক্কা দেবে, হুঃ! আরে আমি যে ইদিকে অর্জুন বৈরিগীর পুত, ও বেটি হয়ে কি গুমর করে!···লাও, এবার গেঁতে তোল দিকিন। যেমনটি বন্নু হুবহু সেই রকম করে যাবে।"

৮

দিন পাঁচেক পরের কথা।

একটা ব্যাপার চরমে উঠিয়া গেলে আবার নামিতে আরম্ভ করে—, ফুলির মনের অবস্থাটা সেই রকম চলিয়াছে। অবশ্য গুমতিম্যান বৃন্দাবনের মর্যাদা বাড়ে নাই তাহার চোখে এতটুকুও, তবে মাঝে মাঝে মনটা কেমন একটু করিয়া উঠিতেছে। আহা, অমন করিয়া মুখের সামনে বলিয়া আসিল! না হয় দাদাকেই বলিল, কিন্তু লক্ষ্যটা তো বৃন্দাবনই। দোষটা

কি তাহার ? না, ফুল দিল অত করিয়া—তাও গোঁসাইয়ের জন্ত ! নাঃ ভাল হয় নাই। রাগ না, চণ্ডাল !

ও পথ দিয়া আর যাইতেই পারে নাই ফুলি এই কটা দিন। জল আনিতেছে গ্রামের অন্তদিকে আশেদের পুকুর থেকে। বিকাল হইয়া গেছে। পুকুরে যাইবার জন্তই গামছাটা কাঁধে ফেলিয়া ঘড়াটা লইতে যাইবে, হঠাৎ একটা হৈ-চৈ উঠিল—"ডাকগাড়ি থেমে গেছে !—গুমতির সামনে ডাকগাড়ি থেমে গেছে।"...একপাল ছেলেমেয়ে ছুটিয়াছে গুমতির পানে। ফুলি তাড়াতাড়ি সদর দরজার দিকে পা বাড়াইতেই সামনে কেষ্ট আসিয়া উপস্থিত। হাঁপাইতেছে।

"ডাকগাড়ি থেমে গেছে !!"

"কি করে রে ?"

"বিন্দাবনদা রাঙা ফেলাক্ দেখালে আর...দেখগে না, আমি হাবলা-দের ডেকে আনি...উঃ, বিন্দাবনদা !—কী দাপট !—উঃ !..."

আবার ছুটিয়া গ্রামের মধ্যে চলিয়া গেল।

দারুণ উদ্বেগ. আর কৌতূহলে ফুলি যত দ্রুত পারিল গুমতির দিকে অগ্রসর হইল। সত্যি ! গাড়িটা একেবারে নিশ্চল হইযা দাঁড়াইয়া আছে। অসম্ভব দৃশ্য ! নিজেই যেন নিশ্চল হইয়া যাইতে হয়। খানিকটা ভিড় হইয়া গেছে, গ্রাম থেকে আরও দলে দলে সবাই আসিতেছে—ছেলের দল, ছুটিয়া ছুটিয়া। গুমতি থেকে একটু দূরে ক্ষেতের একটা আলের ধারে তুইটা তালগাছ গায়ে গায়ে হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, ফুলি একটার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

বিশ্বাস করা কঠিন : আগে আগে বৃন্দাবন, বাঁ হাতের মুঠায় গোল গোল তুইটা কি; ডান হাতে তুইটা ফ্ল্যাগ, রাঙাটা খোলা, তাহার পিছনে

সায়েব ড্রাইভার, তাহার পিছনে সায়েব গার্ড, তাহার পিছনে রেলেরই কয়েকজন লোক, তাহার পর কয়েকজন যাত্রীর লাইন। ইঞ্জিনে একা অভিরাম; একটু মুখ বাড়াইয়া দলটার দিকে নির্বিকার ভাবে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বৃন্দাবন মাঝে মাঝে ঘুরিয়া সাহেব ড্রাইভারের সঙ্গে কি কথা বলিতেছে, তাহার পর ইঞ্জিনটা যে দিকে যাইতেছিল সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে।...এদিকে স্টেশন থেকে কতকগুলো লোকও ছুটিয়া আসিতেছে

ফুলি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিরাট ইঞ্জিনটার অসহায় আক্রোশের মতো সোঁ সোঁ একটানা শব্দ, লম্বা নিশ্চল গাড়ি, চঞ্চল ভিড়, ড্রাইভার আর গার্ড সাহেবের নিতান্তই সাধারণ মানুষের মতো মাটি মাড়াইয়া আগাইয়া যাওয়া—সব কিছু মিলিয়া দৃশ্যটা বড় আশ্চর্য—প্রায় অলৌকিক একটা কিছু বলিয়া মনে হইতেছে; আর সবচেয়ে তাহাকে অভিভূত করিয়াছে এই চিন্তটা যে এই সবার মূলে গুমতিম্যান বৃন্দাবন! সবার আগে, দু'দুটা সায়েবকে পিছনে করিয়া চলিয়াছে, দীর্ঘ ঋজু দেহ, মাথায় বাবরি দুলিতেছে, হাতে আধ খোলা রাঙা টকটকে পতাকাটা হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া পড়ন্ত রোদে ঝকমক করিতেছে—এত বিশিষ্ট --এত অদ্ভুত বোধ হইতেছে ফুলির! মনে হইতেছে যেন একটা ছাই চাপা আগুন, প্রকাশ হইল তো একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়াই প্রকাশ হইল।

প্রায় আধমাইলটাক দূরে একটা ছোট পুল আছে, দলটা তাহার উপর জড়ো হইয়া কি যেন যাচাই করিতে লাগিল। মাঝখানে বৃন্দাবন, রাঙা পতাকা সুদ্ধ হাতটা নাড়িয়া কি সব বলিতেছে মাঝে মাঝে—তাহার দুইদিকে যে দুই সাহেব—তাহাদের।

ক্রমে এ-কান ও-কান করিয়া কথাটা টের পাওয়া গেল।—ডাকগাড়ির জন্ম সিগন্যাল ডাউন হইয়াছে স্টেশনে, একবার এদিকে নজর পড়িতে বৃন্দাবনের যেন মনে হইল একটা লোক পুলের থামে মাথা ঝুঁকাটাইয়া বসিয়া কি করিতেছে। তখনই ছুট! লোকটা তো পলাইল, বৃন্দাবন গিয়া দেখে জোড়ের মুখের চারিটা বোল্টুর মধ্যে দুইটা খোলা। খোঁজ করিতে দেখে পুলের নিচে পড়িয়া। আবার তক্ষুনি ছুট, গাড়ি বুঝি এসেই পড়ে ওদিকে।

গুমতিতে পড়িতো মরি করিয়া আসিয়া পৌছিয়াছে, দেখে গাড়ি ওদিকে স্টেশন ছাড়াইয়া বন বন বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। বৃন্দাবন লাল পতাকা খুলিয়া দাঁড়াইয়া গেল। ব্যস, আর কি!...

গল্পটা যতই মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল ততই শাখা প্রশাখায় পুষ্ট হইতে লাগিল। প্রথমটা নাকি ড্রাইভার গ্রাহ্য করে নাই, ডাকগাড়ির সায়েব ড্রাইভার তো? শেষে বৃন্দাবন খুব কড়া ভাবেই পতাকায় ঝাঁকানি দিতেই বাপের সুপুত্তুর হইয়া ইঞ্জিন রুখিয়া নামিয়া আসে।

তদারক করিতে, বোল্টু দুইটা আঁটিতে, এদিক ওদিক আরও কয়েকটা জোড় পরীক্ষা করিতে প্রায় আধঘণ্টাটাক লাগিল, তাহার পর সকলে ফিরিয়া আসিল; ফিরিতেও বৃন্দাবনই সবার আগে আগে।

যাত্রীরা গাড়িতে উঠিল, গার্ড সাহেব বৃন্দাবনকে কি গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বইয়ে লিখিয়া লইয়া নিজের গাড়িতে উঠিল। ড্রাইভার গিয়া ইঞ্জিনে উঠিয়া একটা কি চাপিয়া ধরিয়া বাঁশিটি বাজাইয়া দিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবনের দিকে চাহিল। বৃন্দাবন রাস্তাটার মাঝখানে দাঁড়াইয়াছে, লাল পতাকাটা ভালো করিয়া গুটাইয়া ফেলিয়া সবুজটা তুলিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দোলাইতে লাগিল, ওদিকে গার্ডও সবুজ

দেখাইল, আর একটা হুইসেল দিয়া ডাকগাড়ির ইঞ্জিন আস্তে আস্তে গুমতি পরিত্যাগ করিল।

ফুলির আর সেদিন পুকুরে যাওয়া হইল না।

একবারে দিন পনের পরের কথাটা বলা যাক।—

আজ আবার বৃন্দাবনের বোন রূপসী আসিয়াছিল, এই লইয়া এই তিনবার। ফুলি সমস্ত দিন বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া বাড়ি ফিরিতে ভাজ বলিল—"আজ দিয়ে দিনু কথা, তোমার সেই যে কি বলে—তাই হয়েছে, বড্ড নাকি দাদার আস্কারা; তাই নয়তো মেয়ের মত নিয়ে বিয়ে একথা কোন্ শাস্ত্রে আচে জানি নে তো…"

ফুলি সেকেণ্ড কয়েক একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"তাহলে মজাপুকুর থেকে জল নেস্‌বার অন্য ব্যবস্থা কোরো ঠাকরুণ,—আমিও এই বলে দিনু।"

ও-পাট'টা যে সেদিন থেকেই উঠাইয়া দিল সে এটা জানাইবার জন্য আবার ঘুরিয়া পাশের কাহার বাড়ি চলিয়া গেল।



আবার রাত দুপুরে গুরুচরণ আসিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিল। দরজা খুলিয়া দেখি সেই রকমআতঙ্কে চক্ষু দুইটা ঠেলিয়া আসিয়াছে, ঠোঁট দুইটা অল্প বিভক্ত, চুল উস্কখুস্ক, বলিলাম—"ফীট-অব-প্রিসেপটার যে! হঠাৎ কি মনে করে?"

গুরুচরণ ভিতরে আসিয়া নিজে হইতে দোরটা অর্গলিত করিয়া হুড়কাটা একবার নাড়িয়া দেখিল, তাহার পর ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"আবার এক ফ্যাসাদ বাধিয়েছে মশাই, দিনকতক ডুব না দিলে চলছে না; চলুন ভেতরে, সব বলছি।"

গুরুচরণ হিন্দীতে যাহাকে বলে "হরফন্দ" সেই জাতীয় লোক, ঘটকালি, হোমিও-প্যাথি, অর্ডার সাপ্লাই, কোষ্ঠী রচনা প্রভৃতি হরেক-রকমের ফন্দি করিয়া দিন গুজরাণ করে। এদিকে কলিকাতায় মার্কিনী সৈন্যদের ছাউনি-পড়া পর্যন্ত তাহাদের নানাভাবে চরাইয়াও বেশ দু'পয়সা করিতেছে, মাঝে মাঝে কাহারও বিরাগভাজনও হইয়া পড়ে, একটু গা-ঢাকা দিয়া খোঁজ

অপ্রেত

লইতে থাকে, তাহার পর সে অন্যত্র বদলি হইয়া গেলে আবার গিয়া নূতন মানুষ পাকড়াও করে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সম্বন্ধ ধরিয়া ওরা এখানকার গুরুবাদে একটু শ্রদ্ধান্বিত, সেইজন্য গুরুচরণ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া নিজের নাম রাখিয়াছে ফীট-অব-প্রিসেপটার।

ঘরের মধ্যে আসিয়া গুরুচরণ হাতের ক্যাম্বিস ব্যাগটা টেবিলের উপর রাখিয়া একটা চেয়ারে বসিল, বলিল—"বাধিয়েছে আবার এক ফ্যাসাদ মশাই।"

প্রশ্ন করিলাম—"কিরম?"

গুরুচরণ মুখটা একটু নিচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল, বেশ একটু বিরক্ত ভাব, তাহার পর হঠাৎ দৃষ্টি তুলিয়া বলিল—"অনেক দেশের অনেকরকম লোক দেখলাম মশাই এই লড়াইয়ের হিড়িকে, কারবারও করলাম অনেকের সঙ্গে, কিন্তু এই অ্যামেরিকানগুলোর মতন এমন ব্যাদড়া মানুষ চোখে পড়ল না, সবাইয়ের ওপর টেক্কা দিয়ে ওদের কিছু করা চাই। ফটো নিচ্চিস—নে, কালীঘাট থেকে আরম্ভ করে একরাশ মন্দিরের ফটো তুলিয়ে দিলুম, কিছু কিছু বিগ্রহেরও। তাতে আশ মিটল না, আমায় তোমাদের কোন জাগ্রত দেবতার ফটো নিতে একটু সাহায্য করো মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার।"

একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম—"জাগ্রত! পেলে কোথায় কথাটা?"

"আমারই দুর্মতি মশাই, কোন একটা মেয়ের সঙ্গে 'লভ্' করছে, একটা কবচ চাইলে। লোভ বড় পাপ মশাই, ভাবলাম একটা মোকা এসেছে, ভালো করে কিছু ডেঁড়েমুসে নিই, এসব দিন তো আর ফিরে আসবে না। বললাম—'সায়েব, কবচ দু'রকম হয়—যদি কোন হেঁজি-

গেঁজি দেবতার কবচ নাও, তাতে চান্স শতকরা পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তর ; না, যদি একেবারে পাকা ব্যবস্থা করতে চাও, শতকরার মধ্যে শতকরা তো কোন কোন জাগ্রত দেবতার কবচ গড়তে হবে আমায়, কিন্তু খরচেও ওটা যদি পঞ্চাশে সারতে পারি তো জাগ্রত দেবতার কবচ একশ টাকার কমে হবে না।' বেটার নাম ওয়েকফিল্ড,ঢ্যাঙা, ডিগডিগে চেহারা, বললে—'না, মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, মিস রেন্‌কে আমি আকণ্ঠ ভালবেসে ফেলেছি, তুমি কোন সেই রকম দেবতারই কবচ বানিয়ে দেও।' পাঁচখানি দশ টাকার নোট টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিয়ে বললে—'এই তোমার আগাম, কাজে লেগে যাও।' কয়েকদিন গেল, একদিন এসে বাকি পঞ্চাশটি টাকা রেখে শেখহ্যাণ্ডের চোটে হাত আমার ছিঁড়ে ফেলে আর কি—'মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, আশ্চর্য তোমাদের এই জাগ্‌রাটা গডেস। মিস রেন্‌ রাজি, ছুটি পেলেই অ্যামেরিকায় গিয়ে আমরা বিয়ে করব।'...তারপর থেকেই ঝোঁক গিয়ে পড়ল ঐ জাগ্রত দেবতার দিকে, একটু দরকার পড়লেই—'তোমাদের কোন জাগরাটা গডেসকে দিয়ে আমার এই কাজটুকু করিয়ে দাও মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার।'—আপনি সদ্‌ ব্রাহ্মণ, আপনার কাছে লুকোব না মশাই, দাঁও বুঝে আমিও দিলাম রেট ডবল করে, আর মাকালীর কৃপায় কেমন একটা পড়তা পড়ে গেল, যাতেই হাত দিই ফলে যায় ; বেশ দু'পয়সা হাতে আসতে লাগল।

এই করে তো চলুক, বেটার হঠাৎ ঝোঁক উঠল জাগ্রত দেবতাদের ফটো নিতে হবে। একদিন হঠাৎ এসে হাজির—'মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপ্‌টার, তোমাদের ওয়াণ্ডারফুল জাগরাটা ডিইটির যা সব ব্যাপার দেখলাম তাই নিয়ে আমি অ্যামেরিকান ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ লিখতে

চাই—কতকটা লিখেওছি, এখন গোটাকতক ফটো পেলে প্রবন্ধটা দামী হয়, তুমি আমায় এ বিষয়ে সাহায্য করো।'

চক্ষু একেবারে চড়কগাছ মশাই! ফটোর ব্যবস্থা আমি কি করে করব? মন্দিরের ফটো চলে আড়েআবডাল থেকে, কিন্তু বিগ্রহের ফটো কি কেউ টপ করে নিতে দেয় মশাই? টের পেলেই দরজা বন্ধ করে দেয়, ম্লেচ্ছ কাণ্ড তো? সবাই পছন্দ করবে কেন? তবুও আশে-পাশের কতকগুলো শিবলিঙ্গের ফটো দিয়েছিলাম তুলিয়ে—অত গ্রাহ্য করে না লোকেরা; কিন্তু যারই একটু ঘটা করে আরতি পূজো হয় এমন সব মূর্তিওলা ঠাকুরই তো হয় কারুর বাড়ির দরদালানে, না হয় কড়া পাহাড়ার মধ্যে,—সেখানে নাক গলাতে দেবে কেন মশাই?...অনেক করে বোঝালাম, ভালো কথায়, আবার ভয় দেখিয়েও বললাম—'ওসব জাগ্রত দেবতা নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করা চলে না সায়েব, ওঁরা যেমন ভালো করতেও তেমনি আবার মন্দ করতেও, কি হতে কি হয়ে পড়বে শেষকালে। আর ফটোটা তোমাদের কেরেস্তানী কাণ্ড কিনা, ওঁদের ততটা পছন্দ নয়। দেখেছ তো অনাচারের ভয়ে তোমাদের দেশের দিকে পা দিতে চান না কেউ, শেষকালে ভাববেন দেখেছ বেটা স-শরীরে নিয়ে যেতে পারলে না তো শেষকালে ফটো নিয়ে যাবার ফন্দি বের করলে। শিবঠাকুর একটু অন্য ধরণের, আচার অনাচারের অত বালাই নেই, কিন্তু কোন জাগ্রত ঠাকুর সে ব্যাপারটা কিভাবে নেবেন কিছুই বলা যায় না, এখন যা চাইছ দিয়ে যাচ্ছেন, শেষে চটেমটে একটা অনিষ্ট না ঘটিয়ে বসেন।'

অনেক করে বললাম মশাই, যতটুকু বুদ্ধি এল মাথায়, কিন্তু ঐ যে আগেই বলেছি এমন ব্যাদড়া জাত তো হয় না, বিপদের কথা শুনে যেন

আরও ক্ষেপে উঠল—'ফটো আমায় নিতেই হবে মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, অনিষ্টই যদি করেন তো সেটাও তো তোমাদের জাগরাটা ডিইটির ক্ষমতার আর একটা দিক, তাতে আমার প্রবন্ধ আরও জোরালো হয়ে উঠবে। না, তুমি করো ব্যবস্থা !'...বুঝুন তর্কের ধারাটা মশাই।...আরে তুই-ই যদি দাঁত ছিরকুটে পড়লি তো তোর জোরালো প্রবন্ধে কি কাজ দেবে তাই একবার ভেবে দেখ !

কোন মতেই যখন রাজি হচ্ছি না তখন মোটা টাকা কবলালে। আগে ফটো পিছু পাঁচ টাকা, সাত টাকা, দশ টাকা পর্যন্ত দিত, একেবারে পঁচিশ টাকায় গিয়ে উঠল; মিথ্যে কথা বলব না, একটু লোভে পড়ে গেলাম মশাই।

তাতো গেলাম, কিন্তু পাই কোথায় তেমন মূর্তি বলুন ? শেষে অনেক ভেবেচিন্তে, সাহাদের গোপীরমণজীউর কথা মনে পড়ল। বারবাড়িতে ঢুকেই চণ্ডীমণ্ডপে যেন জ্বল জ্বল করছেন রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি—যেমন রূপোর মশনদ, তেমনি কাপড়চোপড়, তেমনি গয়নাগাঁটি, হ্যাঁ, মনে হবে, জাগত ঠাকুর বটে। সুবিধে আছে, সাহাদের বাড়ীসুদ্ধু কোথায় চেঞ্জে গেছে, ভেতর বাড়িতে একেবারে তালাবন্ধ। এখন দারোয়ান আর পুজুরী ঠাকুরকে একটু হাত করতে পারলেই কার্যসিদ্ধি হয়। হ'ল রাজি, তবে কিছু খসবে,—পূজারী পাঁচ টাকা, দারোয়ান বেটা দু'টাকা, এই সাত টাকা। ওয়েকফিল্ডের কাছে ওটা সোজাসুজি পনের টাকা করে দিলুম,—মনে করলাম এও গোপীরমণজীউর দয়া, মুফতে আটটা টাকা ঘরে এসে তো গেল।

কৈ মশাই ?—বেটা স্ট্যাণ্ড, ক্যামেরা, কালো কাপড় সব কাঁধে করে নিয়ে গিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে। তা দেখতে হবে বৈকি,—

যেমন রাধার রূপ, তেমনি শ্রীকৃষ্ণের—ঢুলঢুলে চোখ, মুখে হাসি, তেমনি সাজসজ্জে, গয়নাগাঁটি, চোখ ফেরায় কার সাধ্যি!…বেটার মন বসে গেছে দেখে আর এক প্যাঁচ দিয়ে কি করে আরও গোটাকতক টাকা খসাব মনে মনে ভাবছি, এমন সময় ওয়েকফিল্ড হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল,—'মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, এতো তোমার জাগরাটা গডেস নয়!'

'বল কি সায়েব! এমন জ্বলজ্বলে ঠাকুর, এ তল্লাটে এমন দুটি নেই, আর তুমি বল কিনা এ জাগ্রত নয়!'

'না মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, এতো স্লীপিং ডিইটি, চোখ ঢুলে আসছে, যেন যে কোন মুহূর্তেই ঘুমিয়ে পড়তে পারে। এতো জাগরাটা অর্থাৎ ওয়েকফুল ডিইটি হতেই পারে না—দুজনের মধ্যে কেউই নয়, আমার প্রবন্ধের সঙ্গে খাপ খাবে কেন?'

একেবারে দিলে সব ভেস্তে মশাই। কত করে বোঝালাম, কার শুনতে বয়ে গেছে? ঢুলঢুলে চোখ দেখে কী যে মাথায় সেঁদিয়ে গেল—ঘুমন্ত ঠাকুর, এক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়তে পারে, কোন মতেই তা আর বের করতে পারলাম না তার মাথা থেকে। যেমন গেছল তেমনি বেরিয়ে এল সাহাদের বাড়ি থেকে।

যাক, মনে করলাম ঝোঁকটা অন্ততঃ কাটল বেটার, তাই লাভ; ও মশাই! দুদিন না যেতে যেতে আবার সেই উৎপাত! 'করলে না ব্যবস্থা কোনও জাগরাটা গডেসের ফটো তোলবার, মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার?' বললাম—'সায়েব, নিয়ে গেলাম তোমায় অমন জাগ্রত দেবতার কাছে, তুমি তুললে না ফটো, আমি কি করব? জাগ্রত ঠাকুর তো ফরমাসী জিনিস নয়, মাঠে ঘাটেও পড়ে থাকে না!' যখন নেহাৎ

নাছোড়বান্দা, কোন ওষুধই ধরে না, মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেলো মশাই, ভাবলাম গোপীরমণজীউ যখন দিলেন একটু সুবিধে করে, তখন সেটা খাটিয়েই দেখি না—কিছু ট্যাকেও আসতে পারে, বেটা পেছিয়েও যেতে পারে হ্যাদাম দেখে। যখন খুব বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে, দিন তিনেক বিছানায় পড়ে থাকবার ভাণ করে বললাম—'সায়েব, তুমি তো জাগ্রত নয় বলেই খালাস, এখন যত আক্রোশ আমার ঘাড়ে এসে পড়েছে ঠাকুরের ; তিনদিন বিছানা থেকে উঠতে পারিনি—যাই যাই অবস্থা—ডাক্তার ডাক্, বদ্যি ডাক্, তিনদিনে পঁচিশটা টাকা লম্বা হয়ে গেল। কেরেস্তানদের ছোঁন না ওঁরা, তোমাদের কিছু হয় না, মারা পড়ি আমরা। না সায়েব, আর ওসব ফ্যাসাদের মধ্যে টেনো না গরীবকে।'

বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, দুখানি দশ আর একখানি পাঁচ টাকার আনকোরা নোট সামনে বিছিয়ে দিলে—'এই তোমার চিকিৎসার খরচ ফীট-অব-প্রিসেপটার, জাগরাটা ডিইটির ফটো কিন্তু আমার চাই। বোধ হয় যাঁদের দেখলাম তাঁরাও জাগরাটা, কেনই বা মিথ্যে কথা বলতে যাবে তুমি, তবে ওতে আমার প্রবন্ধ ঠিক জমবে না, আমাদের দেশের লোক বিশ্বাসই করতে চাইবে না।'

বিটকেল জাত মশাই, যা একবার ধরবে তা থেকে তো নড়চড় নেই, শেষে টাকাটা পর্যন্ত ডবল করে দিলে, পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ...'জাগরাটা ডিইটির ফটো আমার চাই-ই মিস্টার ফীট-অফ-প্রিসেপটার, করো কোন রকমে জোগাড়।'

মনের পাপ গোপন করতে নেই মশাই, একটু লোভে পড়ে গেলাম। শুধু লোভেই নয়, মা-কালীর দয়ায় দু'পয়সা করে খাচ্ছি দেখে আরও

দু'একজন ভড়ং করে ঢুঁ মারতে লাগলে এদিকে, তার মধ্যে ঈশেন হাজরার ছেলে বৈকুণ্ঠকেও দেখলাম, অমন জালিয়াৎ জোচ্চোর কল্‌কাতা সহরে দ্বিতীয়টি নেই।—পৈতের গোছা আর ফোঁটা-চন্দনের ঘটা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম মশাই, ওয়েকফিল্ডটাকে শেষে না গেঁথে ফেলে। কিন্তু পাই বা কোথায় তেমন জাগ্রত দেবতা? লোভে দুর্ভাবনায় মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়লাম মশাই, শেষে গিয়ে আমার একদিন হরকালী মাসির কথা মনে পড়ে গেল, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

হরকালী মাসিকে আপনি দেখেন নি, ভগবান করুন যেন না দেখতেও হয় কখনও। আমি সম্পর্কে বোনপো, সওয়া আছে, তবুও স্বপ্নে দেখেটেকে ফেললে আঁৎকে উঠি এখনও। মাসি বিধবা, কদমফুল করে মাথার চুল ছাঁটা, এদিকে যেমনি আড়ে, তেমনি দৈর্ঘ্যে। হাঁটুর একটু নিচে পর্যন্ত একটা মটকার থান পরে থাকেন সর্বদা, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখবার জন্যে মাথায় একটা ভিজে গামছা পাট করা।—তা সে কি দিন, কি রাত্রি।

সবচেয়ে তারিফ মাসির গলা, সেই যে রাত থাকতে উঠলেন, সেই থেকে রাত্তিরে একেবারে ঘুমিয়ে না পড়া পর্য্যন্ত ভাঙা কাঁসর সমানে বেজে চলছে, পাড়ার লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। সেই হরকালী মাসির এক ঠাকুর আছেন।"

আমি প্রশ্ন করিলাম—"কি ঠাকুর?"

"ঐটি জিগ্যেস করবেন না, ঠাকুর যে কি ঠাকুর তা পাড়ার লোকে এখন পর্যন্ত কোন হদিস পেলে না। মাসিও বলতে পারেন না, জিগ্যেস করলেই বলেন—পোড়াকপাল আমার, ঠাকুরকেই যদি চিনতুম তবে আর আমার এ দশা হবে কেন? কেউ বেশি খুঁটিয়ে জিগ্যেস করবার সাহসও

পায় না। বছর দশেক আগে কোথায় তীর্থ করতে গিয়েঁ নিয়ে এসেছিলেন—একটা পা, আর চারটে হাতের মধ্যে দুটো হাত ভাঙা। অঙ্গহীন ঠাকুর যে পূজো করতে নেই এটা মাসিকে কারুর বলবারও হিম্মৎ হয়ে উঠল না কখনও, শরীরের যেটুকু বাকি আছে তাইতে আগাগোড়া মেটে সিঁদুর মাখিয়ে একটা টিনের চালার মধ্যে বসিয়ে রেখেছে, ঠাকুরও দিব্যি পূজো খেয়ে যাচ্ছেন। সেই ঠাকুরের কথা আমার মনে পড়ে গেল।"

বোধ হয় ঠাকুরের বর্ণনাতেই একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়া থাকিব, সেই ঝোঁকেই প্রশ্ন করিলাম—"খুব জাগ্রত?"

গুরুচরণ বলিল—"ঘুমুবার ফুরসৎ পেলেন কখন মশাই যে জাগ্রত হবেন না? ঐ তো হরকালী ঠাকরুণের কথা শুনলেন; তারপর সকাল থেকে মাসি ঐ ঠাকুরের তলায় পাড়ার যত লোক তাদের বেটা-পুত কাটছে, অবিশ্যি হাঁড়িকাটে ফেলে না কাটুক, কথারও তো একটা ফল হয়ই; ঠাকুরের দিকে যেন চাইতে ভয় হয় মশাই। ভাবলাম, ঐ ঠাকুরের ওপর দিয়ে ওয়েকফিল্ডের টাকাটা খসাই। ওখানে আর বাছাধনকে ঢুলঢুলে চোখ বলে আপত্তি করতে হবে না। তারপর সেবায়েত হিসেবে মাসিকেও দেখিয়ে দেব, গলার আওয়াজও শুনবে। ব্যস, বাজি মাৎ।

বেহালা থেকে কোশ তিনেক দূরে মাসির বাড়ি, ফলতার লাইন থেকে নেমে কোশখানেক যেতে হয়। একদিন গেলাম মাসির কাছে। তা আদর যত্ন করে মশাই। একথা-সেকথার পর একটু সুযোগ বুঝে আসল কথাটা পাড়লাম, বললাম—'মাসি, ঠাকুরের তোমার একটু ভালোরকম পূজোর বন্দবস্ত করো না, না হয়, টিন সরিয়ে ঘরের ওপরের ছাতটাই পিটিয়ে নাও, বলো তো করি ব্যবস্থা।'

মাসি ঠায় আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রৈল, ঝানু মেয়েছেলে তো? তারপর জিজ্ঞেস করলে—তুই কি ব্যবস্থাটা করবি শুনি?

ব্যাপারটা বললাম, অবিশ্যি আমায় যে টাকাটা দেবে তার কথা বাদ দিলাম, মনে মনে ঠিক করেই ছিলাম ঐ থেকে পঁচিশটা টাকা নিয়ে পিসির হাতে দেব, একটা দায়ে খালাস হওয়া তো, না হয় পুরো টাকাটা এলই না ভোগে।

মাসি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে সবটা শুনে গেল, তারপর গালে চারটে আঙুল চেপে বললে—'তুই যে আমায় অবাক করলি গুরু, সেই ফিরিঙ্গিগুনো?—বনেবাদাড়ে, গেরস্তের অনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়? ...এরপরই মাসির গলা চড়ল। ওর পদ্ধতিই হচ্ছে—যে যাই বলুক, শেষে পর্যন্ত পাড়ার লোককে তার মধ্যে টেনে আনেই। পর্দা চড়াতে চড়াতে আরম্ভ করলে—'একদিন ছিলাম না, এসে শুনলাম পাড়ার অলপ্পেয়েরা একটাকে ডেকে এনে আমার ঠাকুরের ফটোক তুলিয়ে দিয়েছে। অমন জাগ্রত ঠাকুর আমার সেই থেকে যেন মরে আছেন, নৈলে এক একটা করে পাড়ার সব্বাইকে শেষ হোতে হোত না? ঠাকুর কি আমার তেমনি ঢোঁড়া ছিলেন? আমি ছিলাম না, নৈলে কত বড় গোরা সেপাই দেখে নিতাম না একবার? কোথায় ভাবছি মাসি কষ্টে পড়েছে শুনে বোনপো আমার দরদ দেখিয়ে একটু আহা বলতে এল, না, পাড়ার হাবাতাদের মতন সেও কিনা আমার ঠাকুরের...'

এই পর্য্যন্ত বলেই মাসি একেবারে স্টাইল বদলে ফেললে; রাগের ভাব ছেড়ে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের পানে একটু চেয়ে রইল, তারপর কত যেন অনুতাপ হয়েছে এইভাবে গলা সহজ করে বললে—

'হ্যারে, আমার এ হোল কি? আবাগে আবাগীদের সঙ্গে থেকে থেকে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি শেষকালে? না শুরু, আমি এ গ্রামে বাস উঠিয়ে দিয়ে কালীঘাটে গিয়ে থাকব, তুই আমার ব্যবস্থা করে দে।'

উল্ট উৎপত্তি দেখে ঘাবড়ে গেলাম মশাই, করতে এলাম এক, হয় আর—বুড়ি আমার স্কন্ধে চাপবার মতলব করলে নাকি? জিগ্যেস করলাম—'কি হয়েছে মাসি! বাস তুলে দেবার কথা কি হোল?'

মাসি বললে—'কি হয়নি বাবা? এতদিন পরে তুই মাসি বলে এলি—আমারই ভালোর জন্যে—কি করে আমারই ঠাকুরের চালাটুকু একটু পাকা করে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে, আমি এদিকে পাড়ার শতেকখোয়ারদের সঙ্গে এক করে তোকে কিনা মুখঝামটা দিতে বসলাম শুরু। কবে আমার মরণ হবে? আর থাকতে আছে এ পাপ জায়গায়?'

ধড়ে প্রাণ এল মশাই, মাসির যে এমন সুবুদ্ধি হবে, আর এত হঠাৎ, কল্পনাতেও আনতে পারি নি। বললাম—'তাতে কি হয়েছে মাসি? গুরুজন, দুটো কথা না বুঝে বলেই থাকো তাতে হয়েছে কি? তুমি মন খারাপ কোর না, ও আমার আশীর্বাদ। তাহলে নিয়ে আসব ধরে ব্যাটা ফিরিঙ্গিকে? ছোঁবেও না কিছু না, সাতহাত তফাৎ থেকে একটা ফটো তুলে নেবে, তাতে ঠাকুরের ঘরটা যদি একটু ভালো হয়ে যায়, উচিত নয় কি আমাদের রাজি হওয়া? কি জানো মাসি, ভগবান গীতায় দুর্যোধনকে বলেছেন—তিনিই সব করেন কর্মান, আমরা নিমিত্ত মাত্র, টিনের ছাতের ওপর বৃষ্টি পড়লে আওয়াজে ঠাকুরের চোপোর রাত ঘুম হয় না, শিলে বৃষ্টি হোল তো কথাই নেই, তোমার একটি পয়সা খরচ করালেন

না, আমার একটি পয়সা খরচ করালেন না, সাতসমুদ্র তের নদীর পার থেকে এক ব্যাটা ফিরিঙ্গিকে পাকড়ে নিয়ে এসে তার ঘাড় ধরে করিয়ে নিচ্ছেন ব্যবস্থাটা—বোঝ না, একটু তলিয়ে ভেবে দেখবার কথা নয় ?'

মাসি একদৃষ্টে আমার মুখের পানে চেয়ে শুনে যাচ্ছিল, বললে—'আমি মেয়েছেলে, অত শাস্ত্রকথা তো বুঝি না বাবা, তাই করে ফেলছিলাম ভুলটা, তা কবে নে'সবি তাকে ? আর আসছে তো আমাদেরই ভালোর জন্যে, তায় গীতায় নাকি বলছে ঠাকুরই পাঠিয়ে দিচ্ছেন, খাবারটাবারের ব্যবস্থা একটু করে রাখব ? শোর গরুর তো জোগাড় হবে না, একটু মিষ্টিমুখ করিয়ে বিদায় করা আর কি...'

চোখ দেখে, বলবার ভঙ্গিমে লক্ষ্য করে ধরে ফেলা উচিত ছিল মশাই, তবে এ স্টাইলটা মাসির নাকি একেবারে নতুন, ভাঁওতায় পড়ে গেলাম। বললাম—'নিয়ে আসা তোমার যবে সুবিধে। আজ বেরস্পতি-বার, শুক্কুর, শনি দুটো দিন বাদ দিয়ে না হয় রোববার আসি নিয়ে। আর খাবারের কথা বলছ...বাজারের ওরা খায় না, নিজের হাতে গড়ে যদি দিতে পার কিছু তো সে মন্দ নয়, একটু তোয়াজ হয় তো।'

মাসি বললে—'নিজের হাতের বৈকি বাবা, বেশ যত্ন করে নিজের হাতের জিনিসই খাওয়াব আমি, একটা লোক সাতসমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে এতটা উপকার করছে, খেয়ে যদি কিছুদিন তারই না লেগে রৈল মুখে তো কি হোল ? নিজের হাতেরই জিনিস হবে।'

গুরুচরণ একটু চুপ করিল, তাহার পর বলিল—"একটা সিগারেট দিন তো, বেদম করে দিয়েছে মশাই।"

সিগারেটের অর্ধেকটা শেষ করিয়া আবার বলিতে লাগিল—"আজ বিকেলে গিয়েছিলাম মশাই, সোজা সেখান থেকে আসছি। ওয়েকফিল্ড

তো যাবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে ড্যাম গ্ল্যাড। সিঁদুরের ওপর তেল মাখিয়ে মাসি আবার ঠাকুরকে একেবারে 'মারমার কাটকাট' করে রেখেছে, তার ওপর তার নিজের চেহারা আর গলা। না, সায়েবের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় অবিশ্যি করতে এলো না, তবে সায়েব এসেছে দেখে ছেলেমেয়ে ধাড়ি বুড়ো যারা সব এসে জটলা পাকাচ্ছিল, মেরেধরে, হাতপা নেড়ে বাজখেঁয়ে গলা ছেড়ে একলা তাদের মোহাড়া নিয়ে যেভাবে জায়গাটা মিনিট কয়েকের মধ্যে সাফ করে ফেললে, সায়েবের তো একেবারে তাক লেগে গেল মশাই; ফিস ফিস করে জিগ্যেস করলে— 'কে এ ম্যান মিস্টার ফীট-অব্-প্রিসেপটার?'

বললাম—'ম্যান নয় সায়েব, উওম্যান, এই ঠাকুরের সেবায়েত—নার্স।' একেবারে ড্যাম গ্ল্যাড, আমার হাতটা চেপে ধরে বললে—'এই এতদিন পরে তুমি আমার জাগরাটা গডেসের কাছে নিয়ে এসেছ মিস্টার ফীট-অব-প্রিসেপটার, নার্সই যদি এরকম হয় তাহলে আমার সন্দেহ নেই, গডেস সম্বন্ধে; চেহারা তার দেখছিই, মেজাজ সম্বন্ধেও আমার আর খুঁৎখুতুনি রইল না'।

ভ্যাজাল হটিয়ে মাসি গন্ গন্ করে ভেতরের দিকে চলে গেল, বার দু'এক সাহেবের দিকে ফিরে দেখেও নিলে। যতক্ষণ দেখা গেল ওয়েকফিল্ড হাঁ করে চেয়ে রইল, যেন কি অপূর্ব জিনিস দেখছে। মাসি ভেতরে চলে গেলে বললে—'এইবার ফটোটা তুলে নিই মিস্টার ফীট-অব্ প্রিসেপটার; দাঁড়াও দেখি কোন্ অ্যাঙ্গল থেকে সুবিধে হবে। ওয়াণ্ডার-ফুল জাগরাটা গডেস, আমার প্রবন্ধের দাম চার গুণ বেড়ে যাবে।'

আথচার যেমন ছোট একটা ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এ তা নয়, বেশ তোড়জোর করে গেছল মশাই, জাগ্রত দেবতার কথা শুনে, একটা

বেশ মাঝারি সাইজের ক্যামেরা, স্ট্যাণ্ড, মাথা ঢাকবার জন্যে একটা কালো বনাত,—অনুষ্ঠানের কিছু বাকি রাখেনি। কয়েক জায়গায় বসিয়ে বসিয়ে মাসির বাড়ির ঠিক দরজার মুখটিতে গিয়ে স্টাণ্ডে ক্যামেরাটি ফিট করতে লাগল। এই সময় মাসি আমায় ভেতরে ডাক দিলে।

সাহেবকে জিগ্যেস করলাম—'আমায় কোন সাহায্য করতে হবে তোমাকে ?' সায়েব বললে—'না মিস্টার ফীট্-অব-প্রিসেপটার, ধন্যবাদ ; সূর্যটা ঐ ডালটার আড়ালে গেলেই আমি তুলে নোব ফটোটা। মিনিট ছ-সাত লাগবে। ওয়াণ্ডারফুল জাগরাটা গডেস।'

ভেতরে গিয়ে দেখি মাসি আমার জন্যে থালা সাজিয়ে বসে আছে—মালপো, সন্দেশ, নারকেলের নাড়ু, কয়েক রকম ফল, একটি বড় থালায় ঠেসে সাজানো।

বললাম—'এ করেছ কি মাসি, এত কে খাবে, পেট-রোগা মানুষ একে ; এই থেকেই সায়েবের জন্যে তুলে রাখো অদ্ধেকটা।'

খাওয়াবার সময় যেমন বলে মাসি, একটু কড়া করেই বললে—'সায়েবের ব্যবস্থা আছে, তোকে ভাবতে হবে না, তুই একটি একটি করে খেয়ে ফেল। হোল তার ফটো নেওয়া ?'

বললাম—'রোদটা একটু সরে গেলে নেবে, মিনিট পাঁচ সাত দেরি আছে।'

মাসি বসে আমায় খাওয়াতে লাগলো। একটা ব্যাপারে একটু যেন খটকা লাগল মশাই, অন্য অন্য বারে যে রকম গল্পগুজব করে খাওয়ানো, এ সে রকম নয়, মাসি যেন ভেতরে ভেতরে ফুলছে। ঠিক বুঝতে পারছি না ফটো নেওয়াচ্ছি বলে মাসি কি আমার ওপর চটল শেষ

পর্যন্ত? টাকার লোভে রাজি হয়ে রাগটা কি শেষ পর্যন্ত আমার ওপর গিয়েই পড়ল? মনে মনে সাত পাঁচ ভাবছি, এমন সময় মাসি উঠে পড়ল, বললে—'বসে বসে খা গুরু, আমি সায়েবের ব্যবস্থাটা করিগে। খবরদার একটি ফেলে উঠতে পাবি নি, ভয়ানক রাগ করব, আমার জাগ্রত ঠাকুরের পেসাদ।' তখনো যদি একটু সন্দেহ করি মশাই।

মিনিট পাঁচেক হবে। আস্তে আস্তে খেয়ে যাচ্ছি, এমন সময় বাইরে উৎকট আওয়াজ; ঠিক যেন সদর দোর গোড়াতেই। একটা মালপোয় কামড় দিয়েছিলাম, সেইভাবেই হাঁ করে চেয়ে রইলাম। প্রথম একটা গ্যাঁঙানি—তারপর একি! সায়েবের গলা যে! যেন একটা গর্তের মধ্যে থেকে চেঁচাচ্ছে—মিস্টার ফীট্-অব্-প্রিসেপ্টার দৌড়োও।—হেল্প! হেল্প! দি জাগরটা গডেস। নার্সকে ডাকো। দফা শেষ করলে আমার—হেল্প!...'

গিয়ে দেখি এক বিপর্যয় কাণ্ড মশাই! মাসি সায়েবের মুণ্ডু সুদ্ধ্যু ক্যামেরাটা কালো কাপড়টার মধ্যে ভালো করে জড়িয়ে বাঁহাতে কড়কড়িয়ে ধরে আছে, আর ডান হাতে পিঠে শপাশপ ঝাঁটা—দর্জির কলের ছুঁচও অত তাড়াতাড়ি পড়ে না মশাই। আর সেই সঙ্গে আপসানি—'আমার ঠাকুরের ফটোক তুলতে এসেছে! এই তোল, তোল ফটোক। এই এক ফটোক, দু' ফটোক, তিন ফটোক—তোল না কত তুলবি! ঠাকুরের আমার হাত নেই বলে হেঁজি-পেঁজি না? বেওয়ারিস! এইবার টের পা কত জাগ্রত আমার ঠাকুর। আর তুইও আয় এবার—তোকেও দেখিয়ে দিই ঠাকুর আমার কত জাগ্রত। ব্যবসা ফেঁদেছিস, তার মুনাফা নে এসে! চামার! বামুনের ঘরের গোরু! আয় বেরিয়ে!...'

পেছন ফিরে ছিল, দেখতে পায়নি তাই রক্ষে; সায়েবকে বাঁচাবে কে মশাই, যেমন গেছলাম তেমনি ফিরে এসে খিড়কির দরজা খুলে সোজা একেবারে এখানে।

নাক কান মলেছি আর ও পাপের পথে নয়—না খেতে পেয়ে মরি সেও ভি আচ্ছা। তাতো হোল মশাই, কিন্তু সে ব্যাটা ফিরিঙ্গি যে সমস্ত কলকাতায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছে আমায়!...”